স্বাস্থ্য সুরক্ষা

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি স্বপ্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' যার ভিশন হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ' এ প্রথম ঘোষণা করা হয় যে ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' অর্জন করেন। প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এক্ষেত্রে তাঁর অনন্য কৃতিত্বের জন্য ২০১৬ সালে 'উন্নয়নে আইসিটি পুরস্কার' অর্জন করেন ।
- বিগত এক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অনুকরণীয় সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় জুন ২০১৯ পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিতে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ১৮ হাজার ৯৭৫ কি. মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন, ২ হাজার ৪টি ইউনিয়নে ওয়াইফাই রাউটার (Wifi Router) স্থাপন এবং ১ হাজার ৪৮৩টি ইউনিয়নকে নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ই-কমার্স ও ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের ফলে আইটি সেক্টরে বহুমানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে ও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে সব শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ই-সেবার সঙ্গে পরিচিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

নাসিমা আকতার
খাদিজা বেগম
ডা. মুহাম্মদ মুনীর হোসেন
মোঃ আব্দুল্লাহ-হেল কাফি
সালওয়া সালাম শাওলী
ড. সুমাইয়া মামুন
মোছাঃ শেগুফতা নাসরীন
রুমী জেসমিন
ইকবাল হোসেন
ড. মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশিত : ডিসেম্বর, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

সারা তৌফিকা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

প্রমথেশ দাস পুলক

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনো আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড-১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে , ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে । আশা করা যায় পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকটির মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয় এবং এই বই সম্পর্কে কিছু কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি সবাই ভালো আছি। সুস্থ আছি। পঞ্চম শ্রেণি সফলভাবে সম্পন্ন করে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য রইল অভিনন্দন।

'স্বাস্থ্য সুরক্ষা' বিষয়টি এবার নতুন বিষয় হিসেবে ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা পড়ব। আমরা কীভাবে ভালো থাকতে পারি, সেই বিষয়গুলো এখানে মজার মজার কাজের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। শরীরের যত্নের পাশাপাশি মনের যত্ন ও আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলোর যত্ন কীভাবে নেব সে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপায়গুলো শুধু জানা নয়, বরং আমাদের নিজের জীবনে সেগুলো চর্চার ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের এই বইটি আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্যভাবে লেখা হয়েছে। এই বইয়ে অনেক তথ্য না দিয়ে বরং অল্প পরিমাণে শুধু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোই দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা শুধু তথ্য পড়ব না, বা মুখস্থও করব না। এখানে অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শ্রেণিতে মজার মজার কাজ করব। যেমন : ছবি আঁকব, গল্প পড়ব, কমিক পড়ব, নিজের কথা লিখব, ছক বানাব, মানচিত্র আঁকব, তালিকা তৈরি করব, পোস্টার বানাব। আমরা মেলার আয়োজনও করব, নিজের জন্য পরিকল্পনা করব। আরও কত কী!

বইটি এমনভাবে লেখা হয়েছে যেন এটি আমাদের সঙ্গে কথা বলছে। কথার ছলে আমাদের অনেক রকম কাজ করতে বলছে। আমরা এই বইয়ের নির্ধারিত জায়গায় সেই কাজগুলো করব। এসব কাজ করতে করতেই আমরা নিজে থেকেই অনেক কিছু শিখে যাব। যা শিখব সেগুলো নিজের জীবনে চর্চা করব। বইটিতে সুস্বাস্থ্যের যে পরিকল্পনা করব সেগুলো নিজের জীবনে চর্চা করব। চর্চা কতটা করছি সেটি একটি ডায়েরিতে লিখব। এই বিষয়ের সব কাজ এই বই এবং ডায়েরিতে হবে। তাই আলাদাভাবে কোনো বাড়ির বা শ্রেণির কাজের খাতার প্রয়োজন নেই।

এই বই শুধু তথ্য দেবে না; বরং আমাদের নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভালো থাকার উপায় বের করতে ও চর্চা করতে সাহায্য করবে। এই বই তাই আমাদের কাছে রিসোর্স বা সম্পদের মতো। আশা করি বিষয়টি আমাদের ভালো লাগবে।

অনেক শুভকামনা আর ভালোবাসা রইল।

সূচিপত্র

সুস্থ থাকি, আনন্দে থাকি, নিরাপদ থাকি	১-৪০
আমার কৈশোরের যত্ন	৪১ - ৫৫
চলো বন্ধু হই	৫৬ - ৭১
চলো নিজেকে আবিষ্কার করি	৭২ - ৮৮
অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা বলি	৮৯ - ১১৯
সম্পর্কের যত্নে খুঁজে পাই রত্ন	১২০ - ১৩৯

সুস্থ থাকি
আনন্দে থাকি
নিরাপদ থাকি

আমরা সবাই ভালো থাকতে চাই। সুস্থ থাকতে চাই। ভালো থাকার জন্য আমরা কত কিছুই না করি! ভালো থাকা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য যেমন শরীরের যত্ন প্রয়োজন, তেমনি দরকার মনকে ভালো রাখা। সেই সঙ্গে প্রয়োজন রোগব্যাধি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকা। এখন আমরা ভালো থাকার জন্য একটি যাত্রা শুরু করব। সেই যাত্রা সুস্থ থাকা, আনন্দে থাকা ও নিরাপদ থাকার যাত্রা। এই যাত্রায় আমরা ভালো থাকার উপায়গুলো ভেবে বের করব। সারাজীবন সেগুলো চর্চা করব।

শুরুতেই আমরা একটি মজার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ধরনের কাজকে তুলে আনব। সেগুলো নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করব। এর মধ্য দিয়ে আমরা ভালো থাকা বা সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ধারণাগুলো জানব। একটি স্বাস্থ্যমেলা আয়োজনের মাধ্যমে সবার সামনে সেই ধারণাগুলো তুলে ধরব। এর ফলে আমরা সবাই সবাইকে সুস্বাস্থ্য বিষয়ে জানতে সাহায্য করতে পারব। আমরা বুঝতে পারব কী কী কাজ করলে সুস্বাস্থ্যের পথে আমাদের এই যাত্রাটি সফল হবে। সারাজীবন সেই কাজগুলো চর্চা করব।

পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের নির্দেশনায় প্রতিদিন আমরা কিছু শরীরচর্চাও করব। আর ওই শরীরচর্চাগুলো বাড়িতেও নিয়মিতভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে করব।
তাহলে এবার শুরু করা যাক।

আমার দিনলিপি

শুরুতেই আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে কাজগুলো করি সেগুলো ভেবে বের করব। সে অনুযায়ী অপর পৃষ্ঠার ছকটি পূরণ করব। ছকটি প্রতিদিনের জন্য সকাল, দুপুর, বিকাল এবং রাত চারটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিদিন যে কাজগুলো করব সেগুলো করার পরপরই এই বইয়ে লিখে ফেলব। এভাবে প্রতিদিনের কাজগুলো লিপিবদ্ধ করা হলে, আমরা সেটি নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করব।

আমার দিনলিপি

	প্রথম দিন	দ্বিতীয় দিন	তৃতীয় দিন
সকাল			
দুপুর			
বিকাল			
রাত			

আমার স্বাস্থ্যবৃক্ষ

‘আমার দিনলিপি’টি তৈরি করেছি এবং শ্রেণিকক্ষে আমরা যার যার দিনলিপি নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা করে শ্রেণিতে সকলকে নিয়ে শিক্ষক একটি স্বাস্থ্যবৃক্ষ তৈরি করেছেন। এবার পূর্বের পৃষ্ঠার ছকের দিনলিপিতে ফিরে যাই। সেখানে যে কাজগুলো আমরা লিখেছি, সেগুলো দিয়ে সেই স্বাস্থ্যবৃক্ষের মতো করে আমার নিজের স্বাস্থ্যবৃক্ষটি তৈরি করি। গাছটিকে আমরা মনে করি ‘আমার স্বাস্থ্য’, যার তিনটি বড় বড় শাখা আছে।

একটি শাখা শরীর ভালো রাখার কাজগুলো তুলে ধরবে। দিনলিপিতে লেখা আমাদের যে কাজগুলো শরীর ভালো রাখতে সাহায্য করে, সেগুলো একেকটা পাতার মতো করে এই শাখায় লিখব। কাজগুলো হবে খাদ্য ও পুষ্টি, শরীরচর্চা, খেলাধুলা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ক। আরেকটি শাখায় মন ভালো রাখার কাজগুলো স্থান পাবে। দিনলিপিতে যদি মনের যত্ন, শখ, আনন্দ পাই ও ভালো লাগে এমন কোনো কাজ লিখে থাকি, সেগুলো এই শাখায় লিখব। তৃতীয় শাখাটি নিরাপদ থাকার বিষয়গুলোকে তুলে আনবে। শরীর ও মনের যত্নের জন্যই নিরাপদ থাকা প্রয়োজন। রোগমুক্ত থাকলে যেমন আমাদের শরীর ভালো থাকে, তেমনি মনও ভালো থাকে। আবার শরীর এবং মনের যত্ন নিলে রোগ থেকে দূরে থাকা যায়। তেমনিভাবে চারপাশের পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকলে আমাদের শরীর ও মন ভালো থাকে। দিনলিপিতে যদি রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য বা আশপাশের পরিবেশ নিরাপদ রাখার জন্য কিছু লিখে থাকি, সেগুলো এই শাখায় পাতার মতো করে জুড়ে দেব। এভাবে চলো আমরা নিচের ঘরে আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্যবৃক্ষটি তৈরি করি।

আমার স্বাস্থ্যবৃক্ষ

আমার স্বাস্থ্যে আমার দৈনন্দিন কাজের প্রভাব

শ্রেণিকক্ষে স্বাস্থ্যবৃক্ষটি তৈরি করার পরে বেশ কয়েকটি সেশনে শিক্ষক সেটি নিয়ে আমাদের সকলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। নিজেদের কাজগুলোর প্রভাব নিয়ে আমরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে আলোচনা ও উপস্থাপন করেছি। এখন আবার পূর্বের পৃষ্ঠার দিনলিপির ছকে ফিরে যাই। দিনলিপিতে যে কাজগুলো লিখেছি, সেগুলোর প্রভাব ও তার কারণ নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করি। নিচের ছকে তিনটি কলাম রয়েছে। বাম দিকের কলামে আমার দৈনন্দিন কাজগুলো লিপিবদ্ধ করব। মাঝের কলামে এই কাজগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হলে 🙂 চিহ্ন এবং খারাপ হলে ☹ চিহ্ন এঁকে মতামত দেব। শেষের কলামে এগুলোকে কেন ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনে করছি তা লিখব।

আমার দৈনন্দিন কাজ	আমার স্বাস্থ্যে এর প্রভাব ভালো 🙂 বা ☹ খারাপ	কেন ভালো বা খারাপ মনে করছি
খাওয়ার আগে হাত ধুয়েছি	🙂	জীবাণু দূর করে

আমার উপহার

শ্রেণিকক্ষে আমরা মন ভালো রাখা নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছি। সহপাঠীরা আমাদের কিছু ভালো গুণ লিখে উপহার দিয়েছে। উপহারের সেই কাগজগুলো নিচের ফাঁকা ঘরে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিই। যখনই এই উপহারটি আমরা দেখব, আমাদের ভালো লাগবে।

আমার উপহার

আমার অনুভূতি

মনের যত্ন নিয়ে আলোচনার সময় শিক্ষক আমাদেরকে দলগতভাবে 'অনুভূতির তালিকা' তৈরি করতে বলেছিলেন। সেগুলো তৈরি করে সহপাঠীদের সঙ্গে শ্রেণিতে উপস্থাপন করেছি। এবার নিচের ছকের বাম পাশের কলামে নিজের পাঁচটি অনুভূতির তালিকা তৈরি করি। এই অনুভূতিগুলো হলে আমরা কী করি তা পাশের কলামে লিখি। যেমন আনন্দ হলে কীভাবে তা প্রকাশ করি সেটি ছকে লিখি। একইভাবে রাগ, দুঃখ বা ভয় পেলে কীভাবে প্রকাশ করি তা লিখি।

আমার অনুভূতি	কীভাবে অনুভূতিটি প্রকাশ করি

স্বাস্থ্যমেলার আয়োজন

সুস্বাস্থ্য নিয়ে আমরা দলে আলোচনা করেছি। এই বইয়ে নানারকম কাজ করেছি। এবার একটি আকর্ষণীয় স্বাস্থ্য মেলা আয়োজনের পালা। এ জন্য আমরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে যাব। দলগুলো হলো :

- শরীরের যত্ন (খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা)।
- মনের যত্ন (যেসব কাজ মন ভালো রাখে সেগুলো করা -বিনোদন, শখের কাজ, নিজের অনুভূতির যত্ন নেওয়া ইত্যাদি)।
- নিরাপদ থাকা (আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ)।

আমরা কয়েকজন সহপাঠীকে সঙ্গে নিয়ে দলে ভাগ হয়ে তথ্য সংগ্রহ করব। শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে সেটি চূড়ান্ত করব। এরপর সেই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ধারণা স্বাস্থ্যমেলায় উপস্থাপন করব, যাতে অন্য দলগুলো আমাদের দলের কাছ থেকে জানতে পারে। একইভাবে আমরাও অন্য দলগুলোর কাছ থেকে তাদের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানব। তথ্য ও ধারণা উপস্থাপনে আমরা নিজেদের উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল চিন্তা কাজে লাগাব। যেমন : উপকরণ সংগ্রহ করার সময় তা না কিনে পরিবার, আশপাশ থেকে নেব, ছবি আঁকব, মডেল তৈরি করব, কাগজ দিয়ে বানাব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

স্বাস্থ্যমেলা আয়োজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ধারণা অনুসন্ধান

স্বাস্থ্যমেলা আয়োজনের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ধারণা অনুসন্ধান করব। নিচে কিছু তথ্য ও ধারণা দেওয়া হয়েছে। এগুলো থেকে আমরা সাহায্য নিতে পারি। পাশাপাশি অন্যান্য শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, এমনকি ইন্টারনেটের সাহায্যও নিতে পারি।

শরীরের যত্ন

খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা- এগুলো শরীরের যত্নের জন্য প্রয়োজন।

খাদ্য ও পুষ্টি

পঞ্চম শ্রেণিতে আমরা সুষম খাদ্য ও খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়ে জেনেছি। এবার বিভিন্ন খাদ্য উপাদান, এর উৎস ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এর ভূমিকা এবং বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের যত্ন বিষয়ে জানব।

বিভিন্ন খাদ্য উপাদান, এর উৎস এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এর ভূমিকা

খাদ্য উপাদান	কিছু উৎস	স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এর ভূমিকা
শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট	চাল, গম, যব, আলু, চিনি ইত্যাদি	কাজ করার শক্তি জোগায়
আমিষ বা প্রোটিন	মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, পনির, ছানা, কলিজা, ডাল, বাদাম, শিমের বিচি, ছোলা, নারকেল ইত্যাদি	শারীরিক বৃদ্ধি ও গঠনে ভূমিকা রাখে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়
স্নেহ বা চর্বি	সয়াবিন, সরিষা, তিল, বাদাম, চর্বি, ঘি, ডালডা, ডিমের কুসুম ইত্যাদি	কাজ করার শক্তি জোগায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়
খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন	বিভিন্ন ধরনের ফলমূল, দুধ, ডিম, সবুজ শাকসবজি, ঢেঁকিছাঁটা চাল ইত্যাদি	রোগ প্রতিরোধ করে
খনিজ লবণ	সবুজ শাকসবজি, লাল শাক, কচু শাক, ছোট মাছ, নানা রকম ডাল, বাদাম ইত্যাদি	রোগ প্রতিরোধ করে
পানি	সবুজ চিহ্নিত গভীর নলকূপের পানি, সঠিক নিয়মে ফুটানো বা ফিল্টার করা পানি	দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গাপ্রত্যঙ্গাকে সুরক্ষিত রাখে, শরীরে পুষ্টি ও অক্সিজেন পরিবহণে সাহায্য করে
ফাইবার বা খাবারের আঁশ	বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, বাঁধাকপি, বাদাম, ঢেঁকিছাটা চাল, শিম ইত্যাদি	খাদ্য হজমে সাহায্য করে, রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের যত্ন

বয়ঃসন্ধিকালে শরীর দ্রুত বৃদ্ধি পায়, শরীর ও মনের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনও শুরু হয়। মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধি এবং দৈহিক ও অন্যান্য পরিবর্তনের সময়ে সুষম খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। শরীরের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য এ সময়ে অন্য সময়ের তুলনায় বেশি পরিমাণে আমিষ ও শর্করা জাতীয় খাবারের চাহিদা তৈরি হয়। এ সময়ে ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের জন্য আয়রন বা লৌহযুক্ত খাবার যেমন কচুশাক, লালশাক, পালংশাক ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজ ও লবণযুক্ত খাবার ও প্রয়োজনমতো পানি খেতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালে আমাদের শরীরে পানির চাহিদা বেড়ে যায়, এজন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ৭-৮ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে।

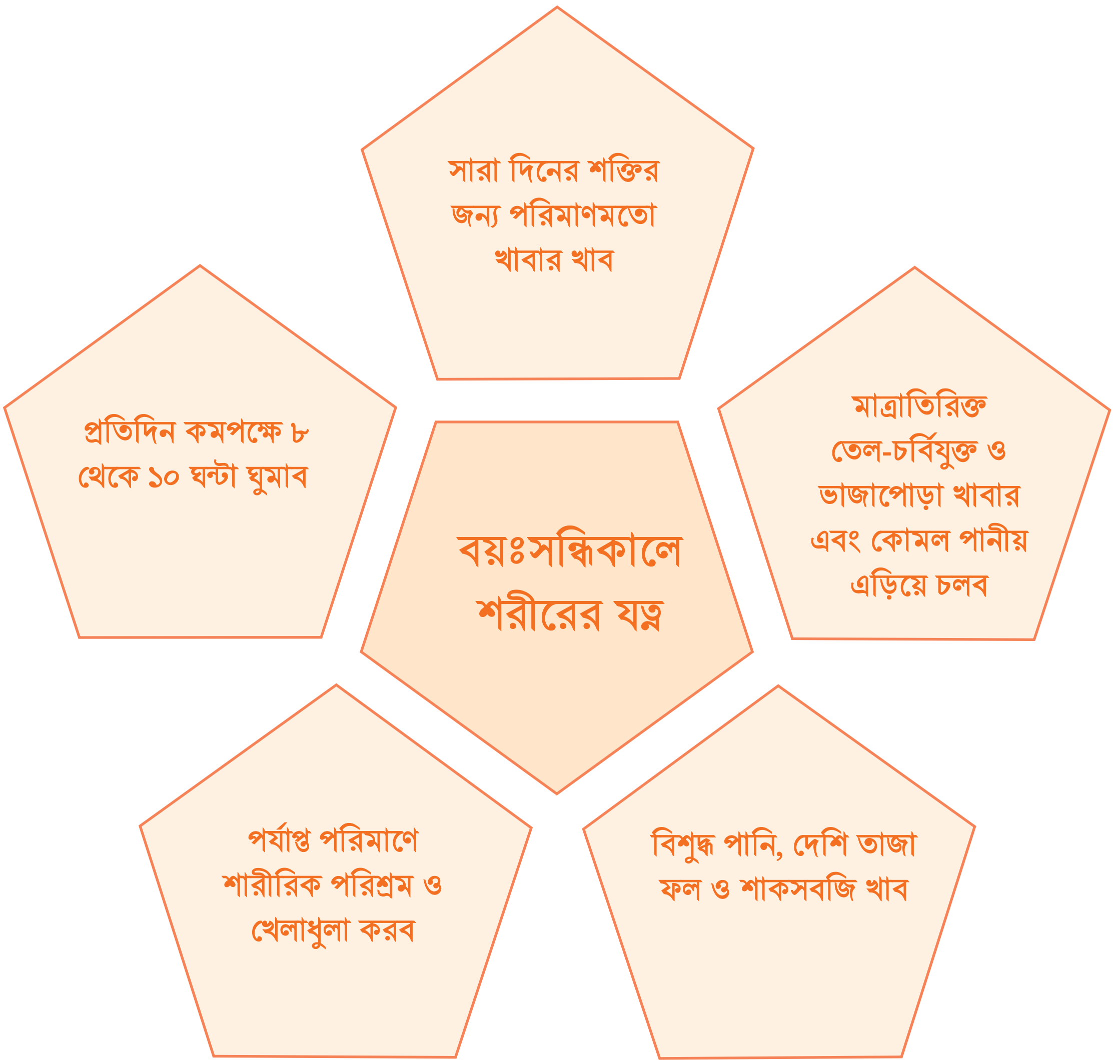

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে আমাদের কতকগুলো স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। এগুলো হলো :

- প্রতিদিন অবশ্যই সকালের খাবারসহ পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া
- খাওয়ার আগে হাত ধোয়া
- বাইরের খোলা ও কৃত্রিম রংযুক্ত খাবার না খাওয়া
- দিনে কমপক্ষে ৭-৮ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করা
- শরীরের বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এবং কর্মক্ষম থাকার জন্য সুষম খাবার খাওয়া
- প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে এবং সকালে খাবারের পরে দাঁত পরিষ্কার করা
- নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা করা
- পরিমিত ঘুমানো এবং বিশ্রাম নেওয়া
- বেশি রাত না জাগা এবং ভোরে ঘুম থেকে ওঠা

শরীরচর্চা ও খেলাধুলা

শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন :

- আমাদের শরীর সুস্থ থাকে। আমরা নীরোগ থাকি।
- আমাদের সামাজিক, মানসিক, আবেগিক ও নৈতিক বিকাশ হয়।
- বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটে।
- লেখাপড়ায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। খেলাধুলার মাধ্যমে স্মরণশক্তি বাড়ে।
- পাঠে একঘেয়েমি দূর হয়।
- শরীরচর্চা ও খেলাধুলা দলবদ্ধভাবে কাজ এবং সমস্যার সমাধান করতে শেখায়।
- নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা বিভিন্ন অনিয়ম করার মত ক্ষতিকর অভ্যাস (রাত জাগা ,সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা ইত্যাদি) থেকে দূরে রাখে।
- খেলাধুলা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।
- মানসিক চাপ কমায়।

খেলা বা গেমসের ধরন :

কোনো ঘরের মধ্যে বা ইনডোরে যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেটাই ইনডোর গেমস। যেমন- ক্যারম, লুডু ইত্যাদি।

ঘরের বাইরে অর্থাৎ খেলার মাঠ বা বড় খোলা জায়গায় যেসব খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয় সেটাই আউটডোর গেমস। যেমন- অ্যাথলেটিকস , ইচিং বিচিং, ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি ইত্যাদি।

শ্রেণিকক্ষে খালি হাতে/সরঞ্জামবিহীন বিভিন্ন ব্যায়াম

১. সাইড টু সাইড বেন্ড

বিবরণ :

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো একটু বেশি ফাঁকা করে দাঁড়াতে হবে। এরপর ডান হাত কোমরে রেখে ডান দিকে কাত হতে হবে। এই সময় বাম হাত কান বরাবর মাথার উপর দিয়ে ডান দিকে কাত হতে হবে। এভাবে সবাই একসাথে করবে।

- সেট : ২
- কতবার : ১০ থেকে ১২বার একেক পাশে।
- সময় : ক্লাসের শুরুতে/মাঝামাঝি

উপকারিতা :

এই ব্যায়ামের মাধ্যমে পেটের পাশের মাংসপেশির শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সেশনের একঘেয়েমি দূর হবে এবং পাঠে মনোযোগ আসবে।

২. হাঁটু বুকে লাগানো

বিবরণ :

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে হাঁটু ধরে টেনে বুকের কাছাকাছি বা বুকের সাথে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে।

- সেট : ২
- কতবার : প্রতি পা ৫ থেকে ৮বার
- সময় : ক্লাসের মাঝামাঝি

উপকারিতা :

পাঠে যে একঘেয়েমি আসে তা দূর হবে এবং পরবর্তী সময়ে পাঠে মনোযোগ আসবে।

৩. স্ট্যান্ডিং এলবো টু নী ক্রানসেজ

বিবরণ :

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধ বরাবর দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াতে হবে। হাতদুটো মাথার পিছনে নিতে হবে। এরপর ডান হাতের কনুই দিয়ে বাম হাঁটু স্পর্শ করতে হবে। বাম হাতের কনুই ডান পায়ের হাঁটুতে লাগতে হবে। এভাবে একবার শেষ হবে।

- সেট : ২
- কতবার : ১০ থেকে ১২বার প্রতি পাশে।
- সময় : ক্লাসের শুরুতে/মাঝামাঝি

উপকারিতা :

এই ব্যায়ামের মাধ্যমে পেটের মাংসপেশির শক্তি বৃদ্ধি হবে এবং পেটের চর্বি কমানো যাবে।

৪. টাইসেপস ডিপস

বিবরণ :

বেঞ্চ বা কোনো চেয়ারের সামনে অথবা কোনো উঁচু জায়গায় চেয়ার বা বেঞ্চের উপর দুই হাত পিছন দিকে রাখতে হবে। এরপর সামনের দিকে পা সোজা করে অথবা হাঁটু ভাঁজ করে পিঠ সোজা রেখে হাতের উপর ভর দিয়ে উপরে উঠানামা করাকে ডিপস বলে।

- সেট : ২
- কতবার : ৫ থেকে ৮বার
- সময় : ক্লাসের শুরুতে

উপকারিতা :

এতে হাতের পেছনের মাংসপেশির শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৫. স্ট্যান্ডিং লান্জেস

বিবরণ :

সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ডান পা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে নিচের দিকে বসতে হবে। তখন পিছনের পা পিছনের দিকে সোজা থাকবে অথবা একটু ভাঁজও হতে পারে। দুই বললে আবার সোজা অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। আবার তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে একইভাবে বাম পা সামনে বাড়িয়ে হাঁটু ভাঁজ করে নিচের দিকে বসতে হবে। এভাবে ৬-৮বার এই ব্যায়াম করতে হবে।

- সেট :
- কতবার : প্রতি পা ৩ থেকে ৫বার
- সময় : সেশনের শেষে

উপকারিতা :

এই ব্যায়ামের মাধ্যমে পায়ের এবং হিপের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৬. হাফ স্কোয়াট

বিবরণ :

সকলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং বসতে বললে সবাই বেঞ্চের উপর বসবে। এভাবে উঠাবসা করাকে হাফ স্কোয়াট বলে। ১০ থেকে ১২ উঠবস করবে।

- সেট : ২
- কতবার : প্রতি পা ৫ থেকে ৮বার
- সময় : ক্লাসের মাঝামাঝি

উপকারিতা :

এই ব্যায়ামের মাধ্যমে পায়ের এবং হিপের শক্তি বৃদ্ধি হবে।

৭. সিট আপস

বিবরণ :

মাটিতে বা ম্যাটে চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটোকে ৯০ ডিগ্রি ভাঁজ করে শুতে হবে। দুই হাত মাথার পিছনে রাখতে হবে। বুক উপরে তুলে হাঁটুর সাথে স্পর্শ করতে হবে। এভাবে বুক উপরে তোলা এবং নামানোকে সিট আপস বলে।

- সেট : ২
- কতবার : ৫-৮বার
- সময় : সেশনের শেষে

উপকারিতা :

পেটের মাংসপেশির শক্তি বাড়ানো ও মেদ কমানোর জন্য এই ব্যায়াম খুবই উপকারী।

৮. জাম্পিং জ্যাক

বিবরণ :

সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং হাত শরীরে পাশে ঝুলানো থাকবে। যখন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ১ বলবেন তখন শিক্ষার্থীরা লাফ দিয়ে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ানোর সাথে সাথে দুই হাত দিয়ে মাথার উপরে তালি বাজাবে। আবার ২ বললে আগের অবস্থানে আসবে।

- সেট : ২
- কতবার : ৮-১০ জাম্প
- সময় : সেশনের শুরুতে বা শেষে

উপকারিতা :

এই ব্যায়ামের মাধ্যমে পায়ের শক্তি এবং কো-অর্ডিনেশন বৃদ্ধি হয়।

আউটডোর গেমস

১. ফর্মুলাওয়ান

খেলার স্থান : খেলার মাঠ

খেলোয়াড়ের সংখ্যা : প্রতি দলে ১০ থেকে

খেলার সরঞ্জাম : বাঁশের লাঠি, কাগজের কার্টুন বক্স, প্লাস্টিকের কোণ, মার্কার, স্টপ ওয়াচ

খেলা পরিচালনাকারীর সংখ্যা : একজন

খেলার বিবরণ : এটি একটি দলগত খেলা। পরিচালনাকারী খেলার সময় নির্ধারণ করবেন। ৬০ মিটার দূরত্বকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। একটি দূরত্ব অর্থাৎ ২০ মিটার স্প্রিন্ট দৌড়ানোর জন্য। একটি দূরত্ব হার্ডেলস বা বেড়া/বাঁধার উপর দিয়ে দৌড়ানোর জন্য এবং অপরটি জিগজাগ এর জন্য। রীলে ব্যাটন হিসেবে একটি নরম রিং থাকবে। প্রত্যেক প্রতিযোগী দৌড়ের শুরুতে একটি ম্যাটের উপর দিয়ে ডিগবাজি (ফ্রন্টরোল) দিবে। এই খেলার প্রত্যেক খেলোয়াড়কে কোর্সটি শেষ করতে হবে । একসাথে একাধিক টিম খেলতে পারবে।

ফলাফল নির্ণয় : সময়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি দলের ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। কোর্স শেষ করতে যে দলের সময় সবচেয়ে কম লাগবে তাঁরা প্রথম হবে। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

পরিচালনাকারীর সহকারী : প্রতিটি হার্ডেলস বা বেড়া, জিগজাগ এবং স্প্রিন্ট এলাকায় দুজন সহকারী নিযুক্ত থাকবে। তারা খেলার সরঞ্জামগুলো যথাস্থানে রাখবে। রীলে জোনে আরও অতিরিক্ত দুজন সহকারী থাকবে। একজন থাকবে স্টার্টার হিসেবে। অন্যজন থাকবে সময় রেকর্ড করার জন্য, সে-ই প্রয়োজনমতো সময় রেকর্ড করবে। টাইম কিপাররা ফলাফল এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবে।

২. ডজবল

খেলার স্থান : খেলার মাঠ

খেলোয়াড়ের সংখ্যা : প্রতি দলে ১০ থেকে ২০ জন

খেলার সরঞ্জাম : ফুটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল অথবা চামড়ার তৈরি একটি বল

পরিচালনাকারীর সংখ্যা : এক থেকে দুইজন।

খেলার বিবরণ : খেলোয়াড়দের দুই দলে বিভক্ত করে এদের একদল একটা বড় বৃত্ত করে বৃত্তের বাইরে দাঁড়াবে এবং তাদের হাতেই বল থাকবে। অপর দলটি বৃত্তের মাঝখানে থাকবে। বৃত্তের বাইরে থাকা খেলোয়াড় বৃত্তের মাঝে থাকা খেলোয়াড়দের মাথার নিচে দেহের অংশে বল লাগাতে চেষ্টা করবে। যে খেলোয়াড়দের দেহে বল লাগবে তারা বৃত্তের বাইরে চলে যাবে। এইভাবে উভয় দলই নির্দিষ্ট সময় খেলবে। যারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশি আউট করতে পারবে তারা জয়ী হবে। তবে খেলার জয়-পরাজয় আরও অনেক রকম হতে পারে।

৩. অ্যাথলেটিকস

অ্যাথলেটিকস বলতে আমরা দৌড়-ঝাঁপ, নিক্ষেপকেই বুঝে থাকি। অলিম্পিক গেমস হচ্ছে সর্বপ্রকার দৌড়-ঝাঁপ নিক্ষেপসহ বিভিন্ন ক্রীড়া। আর অ্যাথলেটিকস হচ্ছে খেলাধুলার একটি বিশেষ আকর্ষণ। অ্যাথলেটিকস এর উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সবার মধ্যে প্রতিযোগিতার স্পৃহা বাড়ে। ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায়।

ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, হ্যান্ডবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, জিমন্যাস্টিক, টেনিস, সাঁতার ইত্যাদি সব ধরনের খেলায় পারদর্শী হতে হলে তাকে অবশ্যই দৌড়-ঝাঁপ, নিক্ষেপে পারদর্শী হতে হবে। কারণ উল্লিখিত সবকটি খেলাতে দৌড়-ঝাঁপ, নিক্ষেপ বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষ যে কোনো খেলায় পারদর্শিতা অর্জন এবং শারীরিক উৎকর্ষতায় অ্যাথলেটিকসের গুরুত্ব অপরিসীম। অধিক গতিতে স্বল্প দূরত্বের দৌড়কে স্প্রিন্ট ইভেন্ট বলে। অ্যাথলেটিকসের ইভেন্টগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন: দৌড়,লাফ এবং নিক্ষেপ। রানিং ইভেন্টের মধ্যে ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার ইভেন্ট, দীর্ঘলাফ, উচ্চলাফ। নিক্ষেপ ইভেন্টের মধ্যে ক্রিকেট বল/টেনিস বল/লৌহ গোলক ক্লাস সিক্সের ছেলেমেয়েদের জন্য বাছাই করা হয়েছে।

দীর্ঘ লাফ

খেলার স্থান : মাঠ (মাঠে একটি জাম্প পিট তৈরি করতে হবে, জাম্প পিট নরম মাটি বা বালি দ্বারা ভরাট থাকবে।

খেলার বিবরণ : ১৫-২০ মিটার দূর থেকে দৌড়ে এসে এক পায়ে টেক অফ (এক পায়ে ভর) নিয়ে উপরের দিকে উঠে সামনের দিকে জাম্প দিয়ে জোড়া পায়ে ল্যান্ড করতে হবে। এভাবে দীর্ঘলাফ সম্পন্ন হয়।

উচ্চ লাফ

খেলার স্থান : মাঠ বা খোলা উন্মুক্ত স্থান। মাঠে নরম মাটি বা বালি দিয়ে ভরাট করে নরম ল্যান্ডিং পিট তৈরি করতে হয়। এর দুই পাশে কাঠের বা অন্য কিছু দিয়ে তৈরি দুটি স্ট্যান্ড, কাঠ বা বাঁশের পাতলা ক্রসবার কিংবা দড়ি টানা থাকে।

খেলার বিবরণ : ১০-২০ মিটার দূর থেকে সোজা দৌড়ে এসে জাম্পের পূর্বে কিছুদূর বাঁকা করে দৌড়াতে হয়। দৌড়ের শেষ পর্যায়ে জাম্প পিটের বিপরীত দিকের পায়ে টেক অফ নিয়ে উপরের দিকে উঠে, জাম্প পিটের দিকে থাকা পাকে প্রথমে দড়ির উপর ক্রস করাতে হয়। পরে টেক অফ পা ক্রস করার পর ল্যান্ডিং পিটে ল্যান্ড করাতে হয়। এভাবে উচ্চ লাফ সম্পন্ন হয়।

ক্রিকেট বল/টেনিস বল/লৌহ গোলক নিক্ষেপ

খেলার স্থান : খেলার মাঠ বা উন্মুক্ত জায়গা

খেলার বিবরণ : খেলার মাঠে একটি দাগ টানতে হয়। এই দাগের ৪-৫ মিটার পিছন থেকে দৌড়ে এসে বলটি নিক্ষেপ করতে হয়। নিক্ষেপের সময় পা দুটি আগে পিছে থাকবে। লৌহগোলক নিক্ষেপের সময় নির্ধারিত বৃত্তের মধ্যে জায়গায় দাঁড়িয়ে দুই পা আগে পিছে দিয়ে লৌহ গোলকটি হাতের তালুতে রাখতে হয়। যেদিকে গোলকটি নিক্ষেপ করতে হবে তার বিপরীত দিকে খেলোয়াড় মুখ করে দাঁড়াবে। শিক্ষক গোলকটি নিক্ষেপ করতে বললে তখন নিক্ষেপ করতে হবে। এই ইভেন্ট পরিচালনার সময় খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. ফুটবল

এটি বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। ফুটবল খেলার মধ্য দিয়েই শারীরিক কর্মদক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, দলগত, একাত্মবোধ, পরস্পর সহযোগিতা, নেতৃত্বদান প্রভৃতি গুণ অর্জিত হয়। আমরা ফুটবল খেলার সাধারণ নিয়ম কানুন জানব এবং খেলব।

খেলোয়াড়ের সংখ্যা : প্রতি দলে ১১ জন।

খেলার সময় : ৪৫ মিনিট +১৫ মিনিট+ ৪৫ মিনিট। ক্লাস সিক্সের শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময় কম হতে পারে। যেমন ১০ মিনিট+ ৫ মিনিট+ ১০ মিনিট।

খেলা পরিচালনাকারীর সংখ্যা : একজন রেফারি। দুইজন সহকারি রেফারি। একজন চতুর্থ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৫. ক্রিকেট

এটি বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। প্রতি দলের খেলোয়াড় সংখ্যা ১১ জন। এই খেলা পরিচালনার জন্য ২ জন আম্পায়ার ও একজন স্কোরার দায়িত্ব পালন করে থাকে।
খেলোয়াড়ের সংখ্যা : একটি দলে ১১ জন খেলোয়াড় থাকে।

৬. সঙ্গী রিলে

খেলার স্থান : খেলার মাঠ

খেলোয়াড়ের সংখ্যা : প্রতি দলে ১০ থেকে ২০ জন

পরিচালকের সংখ্যা : একজন

খেলার বিবরণ : একাধিক দল থাকবে। সবাই লাইনে দাঁড়াবে। প্রথম জন সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটুতে হাত রেখে ভর দিয়ে দাঁড়াবে। বাকি সবাই এক এক করে উপর দিয়ে লাফিয়ে দুই গজ সামনে গিয়ে সামনের দিকে ঝুকে হাঁটুতে হাত দিয়ে দাঁড়াবে। যে প্রথম দাঁড়িয়েছিল সে যখন লাফিয়ে আগে যাবে তখন শেষ হবে। যারা আগে শেষ করতে পারবে তারা জয়ী হবে।

৭. হ্যান্ডবল

খেলোয়ারের সংখ্যা : প্রতি দলে সাতজন করে খেলোয়াড়।

সময়সীমা : ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য এ সময় কম হতে পারে যেমন, ২০ মিনিট+ ১০ মিনিট+২০ মিনিট অথবা ১০ মিনিট+ ৫ মিনিট+ ১০ মিনিট। এই খেলার নিয়মকানুনগুল খেলার পূর্বে শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

৮. সংখ্যা মিলানো

খেলার স্থান : খেলার মাঠ

খেলোয়াড়ের সংখ্যা : ২৫ থেকে ৩০ জন

খেলা পরিচালনাকারীর সংখ্যা : ১জন

খেলার বিবরণ : সকল খেলোয়াড় মিলে একটা বড় বৃত্ত তৈরি করতে হবে। সবাই বৃত্তাকারে চারিদিকে ঘুরতে থাকবে। এমতাবস্থায় খেলা পরিচালনাকারী যে কোনো একটা সংখ্যা বলবে, আর সবাই সেই সংখ্যামতো হবে। যেমন পরিচালনাকারী পাঁচ বললে খেলোয়াড়রা সবাই পাঁচজন করে একত্রে জড়ো হবে। যারা পারবে না অর্থাৎ কম/বেশি হবে তারা বুকডন বা সিটআপ বা ফরোয়ার্ডরোল করবে। এভাবে পরিচালনাকারীর নির্ধারিত সময় মতো খেলা চলবে।

৯. মোরগ লড়াই

খেলার স্থান : খেলার মাঠ

খেলার সরঞ্জাম : চুন/প্লাস্টিক কোণ/মার্কার

খেলা পরিচালনাকারীর সংখ্যা : একজন

খেলার বিবরণ : একটা গোলাকার বৃত্ত তৈরি করতে হবে চুনের গুঁড়া দিয়ে। সব খেলোয়াড়রা মাঝখানে থাকবে। সবাই বামহাত দিয়ে বাম পা অথবা ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের অ্যাংকেল ধরবে। অপর হাত পিছন দিক দিয়ে অন্য হাত ধরবে। পরিচালনাকারীর বাঁশি বাজানোর মাধ্যমে লাফিয়ে লাফিয়ে লড়াই শুরু করবে। যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে সে জয়ী হবে। পিছন দিক থেকে আক্রমণ করা যাবে না।

১০.কাবাডি

প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোর মধ্যে কাবাডি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। এটি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা।

খেলার মাঠ : কাবাডি খেলার মাঠ সমতল ও আয়তাকার হতে হবে।

খেলোয়াড়ের সংখ্যা : প্রতিদলে ৭ জন খেলোয়াড়

খেলার সময় : বড়দের জন্য ৪০ মিনিট। ২০ মিনিট খেলার পর ৫ মিনিট বিরতি দিয়ে আবার ২০মিনিট খেলা। ছোটদের জন্য ৩০ মিনিট। ১৫ মিনিট খেলার পর ৫মিনিট বিরতি দিয়ে ১৫মিনিট খেলা।

খেলার বিবরণ : মধ্য রেখা থেকে দম নিয়ে কাবাডি ,কাবাডি শব্দ উচ্চারণ করতে করতে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে স্পর্শ করে এক নিঃশ্বাসে নিরাপদে নিজের কোর্টে ফিরে আসতে পারলে যাকে বা যাদেরকে স্পর্শ করা হয়েছে, সে বা তারা আউট হবে। এভাবে যতজন আউট হবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক পয়েন্ট পাওয়া যাবে। কোনো খেলোয়াড় বিপক্ষ দলের কোর্টে দম হারালে এবং বিপক্ষ দলের কেউ তাকে ধরে রাখতে পারলে সে আউট বলে গণ্য হবে।

১১. ইচিং বিচিং

খেলাটি বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের একটি জনপ্রিয় খেলা। এতে শারীরিক ভারসাম্য,পায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং নির্দিষ্ট উচ্চতায় লাফ দেওয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

খেলার স্থান : সাধারণত শিশু, কিশোর ও কিশোরীরা এই খেলার জন্য ঘাসের সবুজ মাঠকে নির্বাচন করে থাকে।

খেলার বিবরণ :

- প্রথমে দুজন খেলোয়াড় একে অপরের পায়ে পা লাগিয়ে মুখোমুখি বসে দুপায়ের গোড়ালি দিয়ে খেলোয়াড়দের অতিক্রম করার জন্য উচ্চতা তৈরি করে। পরবর্তী সময়ে তারা পায়ের উপর আরেক পা তুলে দিয়ে এবং পায়ের উপর প্রসারিত করতল স্থাপন করে উচ্চতা বাড়িয়ে থাকে।
- লাফ দেওয়া খেলোয়াড় যদি বসে থাকা খেলোয়াড়কে স্পর্শ করে তবে সে আউট হয়ে যাবে।

- বসে থাকা খেলোয়াড়রা দুই পা মুক্ত করে ত্রিকোণাকার একটি সীমানা তৈরি করে। সফলভাবে অতিক্রমকারী খেলোয়াড়কে পরে এই সীমানা পা তুলে দম দিতে দিতে বা "ইচিং বিচিং চিচিং ছা প্রজাপতি উড়ে যা" ছড়া আওড়াতে আওড়াতে তিনবার লাফ দিয়ে পার হতে হয়।
- এই সীমানা অতিক্রম করার পর বসে থাকা খেলোয়াড়দের যুক্ত পাকে প্রতিটি খেলোয়াড় শূন্যে লাফিয়ে ইচিং বিচিং ছড়া বলতে বলতে দুইবার করে অতিক্রম করে। এটিই খেলার শেষ পর্ব।

ইনডোর গেমস

১.ক্যারম :

ক্যারম খুব জনপ্রিয় একটি খেলা । একক ও দ্বৈত দুভাবেই খেলা যায়।

খেলার সরঞ্জাম : একটি বর্গাকার বোর্ড। ৯টি সাদা, ৯টি কালো, ১টি লাল এবং বড় একটি ঘুঁটি বা স্ট্রাইকার।

খেলার বিবরণ : বোর্ডের মাঝখানে রেড বসিয়ে চারিদিকে পর্যায়ক্রমে সাদা ও কালো ঘুঁটি বসাতে হয়। টসে জয়ী খেলোয়াড় সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলে। ঘুঁটিগুলোকে বোর্ডের চার কোনায় চারটি গোলাকার পকেট ফেলার জন্য স্ট্রাইকারটি ব্যবহার করা হয়। ঘুঁটির পয়েন্ট হচ্ছে ১ এবং রেড এর ৩। খেলায় ২৫ পয়েন্টে এক গেম হবে। তিন গেমের মধ্যে যে পক্ষ সর্বাধিক অর্থাৎ দুই গেমে জয়লাভ করবে সে বিজয়ী হবে।

২.লুডো :

গ্রাম,গঞ্জ, শহরে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং বড়দের কাছে এটি একটি জনপ্রিয় খেলা।

খেলোয়াড়ের সংখ্যা : ২ থেকে ৪ জন।

খেলার সরঞ্জাম : খেলার ছক বা বোর্ড, ঘুঁটি ও ছক্কা বা ডাই।

খেলার বিবরণ : প্রতিটি খেলোয়াড়ের ভিন্ন ভিন্ন রঙের চারটি করে ঘুঁটি থাকে। নিজের ঘর বা স্টপেজ থেকে বের হওয়ার জন্য ডাই চেলে প্রথমে ছক্কা ফেলতে হয় । আবার পরপর তিনবার ছক্কা ফেললে দান বাতিল হয়, পুনরায় ডাই চালতে হয়। ঘর থেকে ঘুঁটি নিয়ে বের হয়ে পুরো ছক অতিক্রম করে ঘরে ফিরে আসার পথে অন্যের ঘুঁটি খাওয়া যায়। আর পুনরায় নিজের ঘরে ফিরে আসতে পারলে ঘুঁটি পাকে। এভাবে যার চারটি ঘুঁটি সবার আগে পাকবে সে বিজয়ী হবে।

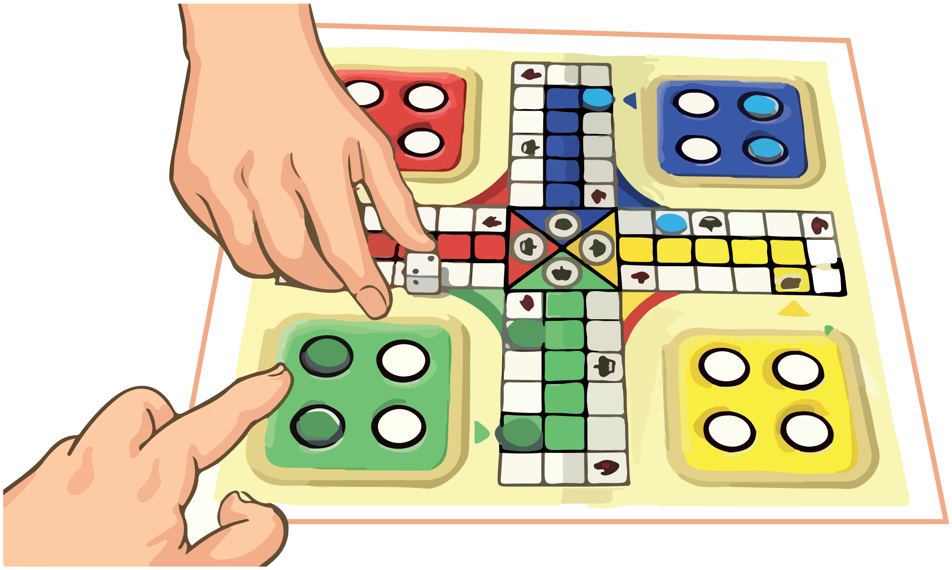

সাপ লুডো : ছকের মধ্যে সাপ এবং মইয়ের ছবি আঁকা থাকে। যে ডাই চেলে প্রথমে ১ ফেলতে পারে সে ঘর থেকে বের হওয়ার সুযোগ পায়। ঘুঁটি সাপের মুখে পড়লে তখন সাপের লেজে ঘুঁটিটি চলে আসে। আবার ঘুঁটি যখন মইয়ের গোড়ায় এসে পরে তখন এটি মইয়ের মাথায় চলে আসে। এভাবে যার ঘুঁটি সবার আগে ১০০ নম্বরে পৌঁছায় সে বিজয়ী হয়।

খেলাধুলায় আঘাত ও প্রতিরোধ :

শরীরচর্চা ও খেলাধুলার সময় কখনো কখনো আমরা আঘাত পেতে পারি। এই আঘাত থেকে রক্ষার জন্য কিছু বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। যেমন :

- শরীরচর্চা ও খেলাধুলার আগে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গা গরম/ওয়ার্ম আপ করা ও পরে কুল ডাউন করা
- বয়স উপযোগী ব্যায়াম করা
- ব্যায়ামের জন্য উপযুক্ত সময় ও যথাযথ ড্রেস নির্বাচন করা
- খেলা, খেলার সরঞ্জাম, খেলার স্থান সঠিকভাবে নির্বাচন করা

যে কোনো খেলাধুলা বা শরীরচর্চার আগে শিক্ষার্থীদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়াই ওয়ার্ম আপ। খেলার আগে দুই থেকে তিন মিনিট আস্তে আস্তে দৌড়ে এবং কিছু ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে গরম করে নিতে হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায় যথাযথভাবে ওয়ার্ম আপ করলে ৫০% ক্রীড়াজনিত আঘাতের আশঙ্কা কমে যায়।

খেলা শেষ করে পূর্ণ বিশ্রামে যাওয়ার আগে শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য শরীরকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করাই কুল ডাউন। কঠিন কাজ বা খেলাধুলার সময় শরীর অত্যন্ত গরম হয়। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ কার্যক্ষম হয়। হঠাৎ করে পূর্ণ বিশ্রামে গেলে শরীরের ক্ষতি হয়। শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য শরীরকে আস্তে আস্তে ঠান্ডা করা হলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। খেলার পরে ২-৩ মিনিট জগিং করতে হয়, জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়তে হয়।

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ও খেলার মাঠে কিছু খেলা ও শরীরচর্চা করিয়েছেন। সেগুলোর নিয়মগুলো মেলায় উপস্থাপন করতে পারি; চাইলে কিছু খেলা বা শরীরচর্চা আমরা করেও দেখাতে পারি।

মনের যত্ন

সুস্বাস্থ্যের জন্য শরীরের পাশাপাশি মনের ভালো থাকার গুরুত্ব অনেক। যেসব কাজ মন ভালো রাখে সেগুলো করা, বিনোদন, শখের কাজ, নিজের অনুভূতির যত্ন নেওয়া ইত্যাদি মনের যত্ন নেওয়ার জন্য প্রয়োজন। আমাদের ভালো লাগার, আনন্দের, মজার অনুভূতিগুলো মনে ও শরীরে শক্তি জোগায়। শিক্ষকের কাছ থেকে আমরা শিখেছি কীভাবে অনুভূতির যত্ন নিতে হয়। আবার কখনো কখনো আমাদের কিছু অনুভূতি হয়, যা নিয়ে আমরা সমস্যায় পড়ে যাই। তখন কী করব বুঝতে পারি না। কী করলে আমাদের মনের স্বাস্থ্য ভালো থাকে তা না জানার কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই। মনের যত্নের এই অংশে আমরা মনের স্বাস্থ্য ভালো রাখার কিছু উপায় জানব যাতে আমরা নিজেরাই নিজেদের মনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারি।

মনের শক্তি কীভাবে অর্জন করতে পারি? কীভাবে তা আমাদের সাহায্য করে?

যা কিছু আমাদের আনন্দ ও তৃপ্তি দেয় তা থেকে আমরা মনে শক্তি পাই। ভালো কাজ যা করে আমি তৃপ্তি পাই, প্রশংসা পাই তা-ও মনে শক্তি জোগায়। নিজের অনুভূতির যত্নও আমার মনে শক্তি জোগায়। মনের শক্তি আমাদের আনন্দে রাখে, উৎসাহ জোগায়, পড়াশোনা বা কাজে ধৈর্য ও মনোযোগ বাড়ায়, অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে সাহায্য করে। মনের শক্তি পেতে যা করতে পারি-

- যে কাজ আমাদের আনন্দ ও তৃপ্তি দেয়, উৎসাহ জোগায়, নিজেদের গুরুত্ব ও ভালোবাসার অনুভূতি দেয় তা করা। যেমন : শখের কাজ, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, স্বাস্থ্যকর বিনোদন।
- প্রতিদিন এ রকম একটি বা দুটি কাজ করা এবং কেমন লাগল তা ডায়েরিতে লিখে রাখা। এতে মন ভালো থাকে। মনের শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

মনের যত্নে নিজের অনুভূতিকে বোঝা ও সেটি কাজে লাগানোর উপায়

আনন্দ, রাগ, দুঃখ এবং ভয় এই চারটি আমাদের মূল অনুভূতি।

আনন্দ

রাগ

ভয়

দুঃখ

- আমাদের যে অনুভূতিগুলোতে আমরা ভালো বোধ করি, খুশি হই, তৃপ্তি পাই, আনন্দিত হই তাকে মনোযোগ দিয়ে গ্রহণ করব। নিজের মধ্যে অনুভব করব এবং তা থেকে শক্তি নেব।
- আনন্দ, রাগ, দুঃখ কিংবা ভয় অনুভূতিগুলোকেও বোঝার চেষ্টা করব। কোনো অনুভূতির জন্য নিজেকে দোষারোপ করব না। ছোট মনে করব না। আমরা মনে রাখব বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় অনুভূতিগুলো তৈরি হয়। এই অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে আমরা যে আচরণ করে থাকি তা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অনুভূতি প্রকাশ করতে আমি যে-ই আচরণ করছি, সেটি আমার বা অন্যের ক্ষতি করতে পারে কি না তা ভাবব। সে ক্ষেত্রে অনুভূতি প্রকাশ করতে অন্য কোনো ইতিবাচক আচরণ বেছে নেব। যেমন : কারও ওপর রাগ হলে তার সঙ্গে চিৎকার না করে, কেন রাগ করেছি বুঝিয়ে বলতে পারি। তার কাছে কী চাই তা স্পষ্ট করে জানাতে পারি। আজ থেকে আমাদের স্লোগান হলো :

নিরাপদ থাকা

আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ- এগুলো নিরাপদ থাকার জন্য প্রয়োজন।

পরিবেশগত স্বাস্থ্য

পরিবেশের সব উপাদানই মানুষের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের তিনটি উপাদান হলো মাটি, পানি ও বায়ু যা প্রতিনিয়তই মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপে দূষিত হচ্ছে। এই ব্যাপক দূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে।

এসব দূষণ থেকে বাঁচার জন্য সচেতন হব। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ করব না। পরিবার, বন্ধু ও প্রতিবেশীরা যেন দূষণ না করেন সেজন্য সচেতন করব। বায়ুদূষণ এড়াতে প্রয়োজনে মাস্ক বা মুখবন্ধনী পড়ব। পানি ভালো করে ফুটিয়ে পান করব। মাটিতে বা পুকুর, ডোবা, খাল-বিল, নদীতে বা অন্য কোথাও নোংরা ফেলব না। অপ্রয়োজনে হর্ন বা মাইক বাজাব না। অন্যের সমস্যা হতে পারে এমন উঁচু আওয়াজের শব্দ করব না। বাড়ির আঙিনা ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।

পরিবেশ দূষণ

বায়ুদূষণ : দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে চোখ, নাক ও গলার সংক্রমণ হতে পারে। বায়ুদূষণের ফলে মানুষের শ্বাসতন্ত্রে ক্যান্সার, শ্বাসতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রের নানাধরনের দীর্ঘমেয়াদি জটিল রোগ, চর্মরোগ ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

শব্দদূষণ : শব্দদূষণে মানুষের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হতে পারে। শব্দদূষণের ফলে ঘুমের ব্যঘাত ও অবসন্নতা সৃষ্টি হয়। মানুষের শ্রবণশক্তি ও কর্মক্ষমতা কমে যায়, নানারকম স্বাস্থ্যগত জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

মাটিদূষণ : মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক, রাসায়নিক সার, গৃহস্থালি ও হাসপাতালের বর্জ্য, কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্যসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর বস্তু মাটিতে মিশে মাটি দূষিত করে। এসব দ্রব্য উদ্ভিদের মাধ্যমে খাদ্যের সঙ্গে মিশে ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ জটিল রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

পানিদূষণ : দূষিত পানি পান করলে মানুষের আমাশয়, কলেরা, ডায়রিয়া, জন্ডিস, টাইফয়েডের মতো পানিবাহিত রোগ হয়। দূষিত পানির ব্যবহার বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত করে।

রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

সংক্রামক রোগ

কিছু রোগ আছে যেগুলো রোগীর কাছ থেকে অন্যদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের রোগকে বলে সংক্রামক রোগ। যেমন : ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিংকাশি, ডিপথেরিয়া, ডায়রিয়া, কলেরা, হেপাটাইটিস, চোখ ওঠা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, হাম, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, এইডস, কোভিড-১৯ ইত্যাদি।

মানুষের শরীর ছাড়াও কোনো বস্তু বা অন্য প্রাণীর মাধ্যমে সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে। সংক্রামক রোগগুলো সাধারণত পানি, বায়ু ও পতঙ্গ এই তিন মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। পানিবাহিত সংক্রামক রোগ যেমন : টাইফয়েড, কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদি। বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ যেমন : জলবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কোভিড-১৯ ইত্যাদি এবং পতঙ্গবাহিত সংক্রামক রোগ যেমন : ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি।

সংক্রামক রোগ ছড়ানোর কিছু মাধ্যম

১. **হাত থেকে খাবারে :** আমাদের হাতে বিভিন্নভাবে ধুলো-ময়লা লাগে। আমরা যখন খাবার তৈরি, সরবরাহ বা পরিবেশন করি তখন আমাদের হাতের ময়লা খাবারে লেগে যেতে পারে। অতঃপর সেই খাবার গ্রহণের ফলে আমরা সংক্রমিত হতে পারি।

২. **খাবার থেকে শরীরে :** আমরা যদি খাবার ভালোভাবে না ধুয়ে অথবা রান্নার সময়ে ভালোভাবে সেদ্ধ না করে খাই, তাহলে খাবারের মধ্যে থাকা জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে আমাদের বিভিন্নভাবে রোগাক্রান্ত করতে পারে। সংক্রামক রোগ ছড়ানোর অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে পানি। আমরা যদি বিশুদ্ধ পানি পান না করি, তবে পানিতে থাকা বিভিন্ন রোগের জীবাণু সহজেই আমাদের সংক্রমিত করতে পারে।

৩. **রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে অন্যের শরীরে :** কিছু কিছু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখের লালা, নাকের পানি, এমনকি চোখের পানিতেও জীবাণু থাকতে পারে। নাক, মুখ, চোখে হাত দিয়ে সেই হাত না ধুয়ে অন্যের শরীর স্পর্শ করলে তার শরীরও জীবাণু আক্রান্ত হতে পারে। এ ছাড়াও আক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচি, কাশি দিলে মুখের লালা বা নাকের পানি কণা বা বিন্দু আকারে বাতাসে মিশে যায়। জীবাণুযুক্ত বাতাস যখন অন্যের শরীরে নাক, মুখ, চোখ দিয়ে প্রবেশ করে তখন সুস্থ ব্যক্তিও বাতাসে ভেসে থাকা এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

৪. **আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে মশার মাধ্যমে :** কোনো কোনো সংক্রামক রোগ যেমন : ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি মশার মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হতে পারে।

৫. **রোগে আক্রান্ত প্রাণীর মাধ্যমে :** আক্রান্ত কুকুর বা বিড়ালের কামড়ে মানুষের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগ ছড়ায়।

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের উপায় :

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে আমরা অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করব :

১. সব সময় খাওয়ার আগে এবং মলত্যাগ করার পর খুব ভালোভাবে সাবান, মাটি বা ছাই দিয়ে হাত ধোব। বাড়ির বাইরে থেকে আসার পরেও সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত-মুখ ধোব।

২. সব সময় বিশুদ্ধ পানি পান করব।

৩. ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে যাওয়া থেকে বিরত থাকব।

৪. নিজে ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হলে অবশ্যই অন্যদের থেকে নিজেকে আলাদা রাখব।

৫. হাঁচি-কাশির সময় অবশ্যই হাতের কনুই অথবা রুমাল দিয়ে নাক ও মুখ ঢাকব।

৬. ফলমূল বা অন্য কোনো কাঁচা খাবার খাওয়ার আগে অবশ্যই খুব ভালোভাবে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে নেব।

৭. খাবার খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে রান্না করব। বাড়িতে যিনি রান্না করেন তাকে বলব।

৮. পচা, বাসি খাবার খাব না। খাবার সংরক্ষণের জন্য খাবারের মান ঠিক থাকে এমন পদ্ধতি ব্যবহার করব। স্বাস্থ্যকর উপায়ে সংরক্ষণ না করলে সে খাবার খাওয়া যাবে না।

৯. যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে রক্ত শরীরে নেওয়ার আগে (পরিসঞ্চালন) অবশ্যই রক্তের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে নেব এবং অন্যদেরও বলব।

১০. সহজলভ্য সকল সংক্রামক রোগের টিকা নেব।

১১. যেকোনো মহামারি বা অতিমারির সময় স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক যে কোনো নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলব।

১২. টিকা না দেওয়া কুকুর, বিড়াল বা অন্য কোনো বন্যপ্রাণীর সংস্পর্শে আসব না।

অসংক্রামক রোগ :

যেসব রোগ এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির শরীরে ছড়ায় না, এসব রোগকে অসংক্রামক রোগ বলে। যেমন : ক্যান্সার, প্যারালাইসিস, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। এসব রোগ সম্পর্কে আমাদের সচেতন ও প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধের উপায় :

- প্রতিদিন কমপক্ষে ১ ঘণ্টা শরীরচর্চা ও খেলাধুলা করা
- সব ধরনের কোমল পানীয় বর্জন করা
- অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করা
- নিয়মিত ও পরিমিত বিশ্রাম নেওয়া ও ঘুমানো
- কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা না করা
- কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা হলে তা সমাধানের চেষ্টা করা।

আমার দলের তথ্য ও ধারণাগুলোর একটি সারাংশ

এই বই, অন্যান্য শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, ইন্টারনেট ইত্যাদির সাহায্যে আমরা আমাদের দলের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের তথ্য ও ধারণার খসড়া তৈরি করেছি। শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে সেটি চূড়ান্তও করেছি। এবার নিচের ছকে সেই তথ্য ও ধারণাগুলোর একটি সারাংশ নিজেদের মতো করে লিখে অথবা ছবি এঁকে প্রকাশ করি।

স্বাস্থ্যমেলায় তথ্য ও ধারণাগুলো আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি

আমরা দলগতভাবে দায়িত্ব অনুযায়ী তথ্য ও ধারণা চূড়ান্ত করেছি। এবার মেলায় তা উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পালা। দলগতভাবে আলোচনা করি- কোন উপায়ে এই তথ্য ও ধারণাগুলোকে আকর্ষণীয়ভাবে স্বাস্থ্যমেলায় উপস্থাপন করতে চাই। সেজন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ যেমন: পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, ছবির ধাঁধা ও লিফলেট তৈরি করতে পারি। স্বাস্থ্যমেলায় উৎসবমুখর ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনার জন্য মেলায় স্টল কীভাবে সাজাব তার একটি পরিকল্পনা করি। কী কী উপকরণ ব্যবহার করব তার একটি তালিকা তৈরি করে নিতে পারি। স্টলটি কীভাবে সাজানো যায় তার ধারণা নিচের ছবি থেকেও নিতে পারি। শিক্ষক কয়েকটি সেশনে এই পরিকল্পনা করতে আমাদের সাহায্য করবেন।

স্বাস্থ্যমেলার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হলে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে মেলায় নিজেদের নির্দিষ্ট স্টলে অবস্থান করব। স্টলে অন্য সহপাঠীরা এলে তাদের সামনে আকর্ষণীয়ভাবে তৈরি করা তথ্য ও ধারণাগুলো তুলে ধরব। অন্য স্টলে গিয়ে তাদের কাছ থেকে তাদের তৈরি করা তথ্য ও ধারণাগুলো জেনে নেব। যতটা সম্ভব আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নতুন নতুন তথ্য ও ধারণা জেনে নেব। প্রয়োজনমতো তথ্য লিখেও রাখব। নিশ্চিত করব আমাদের দলের প্রত্যেক সহপাঠী যেন অবশ্যই অন্য সব স্টলে যায়।

স্বাস্থ্যমেলায় যা শিখলাম

প্রতিটি দলের কাছ থেকে যে তথ্য ও ধারণা পেয়েছি, সেগুলোর মধ্যে কোনগুলো আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে? কোনগুলো আমার জীবনে কাজে লাগাতে পারি? এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ধারণা নিচের ছকে লিখে ফেলি। আমাদের দলগত বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ধারণাগুলোও নিচের ছকে লিখে ফেলি।

শরীরের যত্ন নিতে যেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ধারণাগুলো আমি নিজের জীবনে কাজে লাগাতে চাই	

মনের যত্ন নিতে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ধারণাগুলো আমি নিজের জীবনে কাজে লাগাতে চাই	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

নিরাপদ থাকতে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ধারণাগুলো আমি নিজের জীবনে কাজে লাগাতে চাই	

আমার স্বাস্থ্যে আমার দৈনন্দিন কাজের প্রভাব : ফিরে দেখি

স্বাস্থ্যমেলায় আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ধারণা জানলাম। শুরুর দিকে 'আমার স্বাস্থ্যে আমার দৈনন্দিন কাজের প্রভাব' শিরোনামের একটি ছক পূরণ করেছিলাম। স্বাস্থ্যমেলায় যেসব স্বাস্থ্য তথ্য ও ধারণা অর্জন করেছি, তার ভিত্তিতে আবার নিচের ছকটি পূরণ করি। দেখি আমাদের উত্তরে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না। নতুন ছকটি পুরোনো ছকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি।

আমার দৈনন্দিন কাজ	আমার স্বাস্থ্যে এর প্রভাব ভালো বা খারাপ	কেন আমি ভালো বা খারাপ মনে করছি	আগের ছকের সঙ্গে উত্তরে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? এলে তার কারণ কী?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমার নতুন স্বাস্থ্যবৃক্ষ

ইতোপূর্বে নিজেদের দৈনন্দিন কাজগুলো দিয়ে আমরা যে স্বাস্থ্যবৃক্ষটি তৈরি করেছিলাম চলো সেটি আবার দেখি। সেখানে সুস্বাস্থ্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছিল কি? তাহলে সেগুলোকে যোগ করে নিচের খালি জায়গায় এবার আমরা নতুন আরেকটি স্বাস্থ্যবৃক্ষ তৈরি করি। আমাদের আগের স্বাস্থ্যবৃক্ষের সঙ্গে এবারের স্বাস্থ্যবৃক্ষের কী পার্থক্য? সুস্বাস্থ্যের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে ও বুঝে আমরা নিজেদের পছন্দমতো কাজ দিয়ে নতুন স্বাস্থ্যবৃক্ষটি তৈরি করেছি। নিঃসন্দেহে এটি একটি দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিজেকে প্রশংসা করার মতো একটি কাজ আমরা করেছি। এ জন্য আমরা নিজেকে ধন্যবাদ জানাই। এখন থেকে এর নিয়মিত চর্চা আমাদের সুস্বাস্থ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমার নতুন স্বাস্থ্যবৃক্ষ

আমার নতুন দিনলিপি

আমরা স্বাস্থ্যবৃক্ষটি নতুন করে তৈরি করেছি। এবার নতুন করে দিনলিপি তৈরি করার পালা। শুরুতেই যে দিনলিপি তৈরি করেছিলাম চলো সেটি আবার দেখি। সেই দিনলিপিতে কী নেই, নতুন কী কাজ যোগ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি? এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যমেলায় অর্জন করা স্বাস্থ্যবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোকে কাজে লাগাব। নিচের ছকে আমরা একটি সাপ্তাহিক কাজের পরিকল্পনা তৈরি করব। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের প্রতিটি বিষয়ই যেন আমাদের দিনলিপিতে স্থান পায়। অর্থাৎ দিনলিপিতে যেমন শরীরের যত্নের জন্য কাজ থাকবে, তেমনিভাবে মনের যত্নের জন্য কিছু কাজও উল্লেখ করব। নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকার জন্য কী কী কাজ করব তাও লিখব। আগের মতোই নিচের ছকে সকাল, দুপুর, বিকাল ও রাত এভাবে সময় ভাগ করে দেওয়া আছে। শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র-এভাবে সাত দিনের ঘর দেওয়া আছে। কাজটি আরো ভালোমতো বুঝতে চাইলে প্রয়োজনে আমরা শিক্ষকের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারি। এবার শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে নতুন দিনলিপিটি চূড়ান্ত করি।

	সকাল	দুপুর	বিকাল	রাত
শুক্র				
শনি				
রবি				

	সকাল	দুপুর	বিকাল	রাত
সোম				
মঙ্গল				
বুধ				
বৃহঃ				

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সুস্বাস্থ্যের চর্চা

এই অধ্যায়ের কাজগুলোর মধ্য দিয়ে ভালো থাকার বা সুস্বাস্থ্যের জন্য কী কী প্রয়োজন তা আমরা জেনে গেছি। এখন চর্চা করার পালা। এই বছরের বাকি সময় জুড়ে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কাজগুলো করব। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ বা চর্চাগুলো ব্যক্তিগত ডায়েরি বা জার্নালে লিখে রাখব। নির্দিষ্ট সময় পরপর কাজের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে শিক্ষককে দেখিয়ে নেব। পাশাপাশি শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় পরপর আমাদের সঙ্গে শ্রেণিতে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন। এভাবে চর্চা এবং মতবিনিময় বছরজুড়ে চলবে।
ডায়েরি বা জার্নাল লেখার সময় নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে লিখব :

- গত একমাসে নতুন দিনলিপি অনুযায়ী কোন কাজগুলো করেছি?
- কাজগুলো করতে কেমন লেগেছে?
- এই কাজগুলো আমাকে সুস্থ থাকতে, আনন্দে থাকতে ও নিরাপদ থাকতে কীভাবে সাহায্য করেছে?
- কাজগুলো করতে গিয়ে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি কি? হয়ে থাকলে কীভাবে তা মোকাবিলা করেছি?
- শিক্ষক বা পরিবারের কাছে কি আমার কোনো সাহায্য দরকার? সেগুলো কী?

মনে রাখব এটি শুধু এক বছরের বিষয় নয়, এই যাত্রা সারা জীবনের। এই বছরে আমরা সুস্বাস্থ্যের জন্য অভ্যাস গড়ে তুলব। এ অভ্যাসগুলো আমাদের সারা জীবন সুস্বাস্থ্যের পথ দেখাবে। এই অধ্যায়ের কাজগুলো সুন্দরভাবে করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সুস্বাস্থ্যের পথে যাত্রার পরিকল্পনা করতে পারার জন্য রইল অভিনন্দন। সামনের দিনগুলোতে সুস্বাস্থ্যের চর্চা বজায় রাখার জন্য শুভকামনা থাকল।

আমার অগ্রগতি, আমার অর্জন

নিচের ছকগুলো শিক্ষক পূরণ করবেন। এর মাধ্যমে আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দেবেন। উৎসাহ দেবেন। কীভাবে আরও ভালো করতে পারি সেই উপায় জানাবেন। শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

ছক ১ : আমার অংশগ্রহণ ও এই বইয়ে করা কাজ

	সেশনে আমার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ	অংশগ্রহণের সময় অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাশীল আচরণ	এই বইয়ে করা কাজগুলোর মান
শিক্ষকের মন্তব্য ও পরামর্শ			

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ছক ২ : স্বাস্থ্যমেলায় আমার দলের কাজ

মেলা আয়োজনকারী দলের নাম :	মেলা পরিকল্পনার কাজগুলোতে আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ	মিথস্ক্রিয়া ও আকর্ষণ তৈরিতে মেলায় প্রদর্শিত বিভিন্ন উপকরণের উপযুক্ততা	এই বইয়ে করা কাজগুলোর মান
শিক্ষকের মন্তব্য ও পরামর্শ			

ছক ৩ : আমার সুস্বাস্থ্য চর্চা

মেলা আয়োজনকারী দলের নাম :	আমার করা পরিকল্পনাটির মান	পরিকল্পনা অনুযায়ী করা চর্চা বা কাজগুলো ডায়েরিতে লেখা	চর্চা কাজগুলোতে সুস্বাস্থ্যের সঠিক ধারণাগুলোর প্রতিফলন
শিক্ষকের মন্তব্য ও পরামর্শ			

আমার কৈশোরের যত্ন

কৈশোর নিয়ে এ আলোচনায় আমরা নিজেকে একটু ভিন্নভাবে খুঁজে পাব। এ অধ্যায়ে আমরা কী জানব বলো তো? আমরা এ অধ্যায়ে একটি ভ্রমণকাহিনি সম্পর্কে জানব। বলতে পারো এটা কীসের ভ্রমণ? এই ভ্রমণ বা যাত্রা হলো আমাদের নিজেদের পরিবর্তনের যাত্রা। একটু সহজ করে বলি- জন্মের সময় আমরা খুব ছোট ছিলাম। ধীরে ধীরে আমরা বসতে শিখেছি, হাঁটতে শিখেছি, দৌড়াতে শিখেছি, স্কুলে ভর্তি হয়েছি। পঞ্চম শ্রেণি শেষ করে এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছি। এভাবেই আমরা শিশুকাল থেকে কিশোরকালে বা কৈশোরে চলে এসেছি। এটাকে বয়ঃসন্ধিকালও বলে। এই যে একটু একটু করে আমরা বড় হচ্ছি, এটা একটি যাত্রা। আমাদের একান্ত নিজস্ব যাত্রা। এ যাত্রায় আমাদের কত ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে! এসবের কিছু শারীরিক, কিছু আবার মানসিক। এ অধ্যায়ে এই পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা জানব। কীভাবে এই পরিবর্তনগুলোর মাঝে নিজেকে সুস্থ রাখা যায় তা ভেবে বের করব। সেগুলো নিজ জীবনে চর্চা করব।

এই যাত্রার বিষয়ে জানার সময় আমরা শ্রেণিতে অনেক কাজ করব। তাহলে এবার শুরু করা যাক।

নিচের কমিক দুটি পড়ি

কমিক দুটি পড়ে কি আমরা নিজের সঙ্গে কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি? সজীব ও রীতার মতো আমাদেরও কি এমন হয়? তাদের মতো আমরাও কি নিজেদের মধ্যে এমন কোনো পরিবর্তন বুঝতে পারি? কেন এমন হচ্ছে? এই যে আমরা একটু একটু করে বড় হচ্ছি এটা এক ধরনের পরিবর্তন। যতদিন যাবে আমরা এভাবেই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকব। এখন আমরা যে সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এ সময়টার নাম হলো বয়ঃসন্ধিকাল। শৈশব ও যৌবন এ দুইয়ের মাঝে এটি সেতুর মতো কাজ করে। নিচের সেতুর ছবিটি দেখলে এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা পাবে।

আমরা এখন যে বয়সটায় আছি, সেদিক থেকে আমরা কিশোর বা কিশোরী।

এ সময়টা জীবনের এমন একটি সময় যখন শরীরে ও মনে অনেক ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। সজীব ও রীতাও আমাদের বয়সি একজন কিশোর ও কিশোরী।

কমিক দুটি নিয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে আমরা শ্রেণিতে আলোচনা করেছি। নিচে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন নিয়ে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো। আমরা এ পরিবর্তন সম্পর্কে যা জানি তা প্রশ্নগুলোর নিচে দেওয়া ফাঁকা জায়গায় লিখে ফেলি। উত্তরগুলো সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব; চাইলে কাউকে বলতে পারি, আবার নাও বলতে পারি। উত্তর লিখতে গিয়ে কিছু বোঝার প্রয়োজন হলে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করব।

কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সম্পর্কে আমার ধারণা

বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সম্পর্কে আমি কী জানি?
আমার শরীরে কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করছি?
আমার মনে নতুন কী ভাবনা আসে?
এসব পরিবর্তনের কারণে আমার দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস বা আচরণের কী পরিবর্তন হয়েছে?

কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন জীবনের একটি স্বাভাবিক বিষয়। এই পরিবর্তনের যাত্রার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষকেই যেতে হয়। শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। কী হচ্ছে আমার সঙ্গে? কেন এমন হচ্ছে? কার কাছে যাব? কী বলব? বললে আবার কেউ কিছু মনে করবে না তো? কীভাবে সমস্যার সমাধান হবে? এসব নানা প্রশ্ন মনে আসে। এই প্রশ্নগুলোর সমাধান নিচের কেসগুলোর মাধ্যমে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

নিচের কেসগুলো পড়ি

কেস-১

দীপা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। সে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে নিয়মিত আসত। বরাবরই সে বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফল করত। কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই দেখা গেল প্রতি মাসেই সে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কয়েক দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। এই সময়ে বাড়িতে অবস্থান করে। এ কারণে শ্রেণির কাজে অংশ নিতে পারে না। এতে করে তার পড়াশোনার মারাত্মক ক্ষতি হয়। একদিকে তার পড়াশোনার ক্ষতি অন্যদিকে জীবনের এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। কি করবে ভেবে পায় না। সারাক্ষণই সে মনমরা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে সে লজ্জাবোধ করে। নানা ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব তার মনে ভর করে। বিদ্যালয়ে সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী এমনকি মায়ের সঙ্গেও তেমন কথা বলে না। একা থাকতে চায়, সবার সামনে আসতে চায় না। এ বছর সাময়িক পরীক্ষাতে সে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। সে সব,সময় দুশ্চিন্তায় থাকে। নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়েও সে চিন্তিত।

দীপার সমস্যাটি তো জানলাম। এবার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই।

ক. দীপার বাড়িতে অবস্থান করার কারণ কী?
খ. ঐ সময় বাড়িতে থাকতে দীপার কেমন লাগত?

গ. দীপার মনের ভিতর কী চলছিল?

ঘ. কী করলে দীপা নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে না বলে তোমার মনে হয়?

কেস-২

রানা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। শিক্ষকের কথা মেনে চলে। বন্ধুরা তাকে ভালোবাসে। তার প্রতিবেশী, পরিবারের সবার কাছেই সে স্নেহের পাত্র। কিন্তু কিছু দিন থেকে সে কারও সঙ্গে খেলাধুলা করে না। স্কুলেও নিয়মিত যায় না। মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে। সে তার এই অস্থিরতার কারণ কাউকে খুলে বলতে পারে না। তার মা খেয়াল করলেন, সে তার ঘরে কাউকে আসতে দেয় না। সে নিজের কাপড় চোপড়ও কাউকে ধরতে দেয় না। হঠাৎ করেই রেগে যায়। কিছু বলতে গেলে সে কখনো সংকোচ বা লজ্জাবোধ করে। এমন পরিস্থিতিতে তার আশপাশে যারা থাকত তারাও ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। তার নিজের এমন অবস্থা নিয়ে সে নিজেই শঙ্কিত।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

রানার সমস্যাটি জানলাম। এবার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই।

ক. কেন সবাই রানাকে এত পছন্দ করে?

খ. কিছু দিন ধরে রানার মাঝে কী কী পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে?

গ. রানার কিছু একটা বলতে সংকোচ বোধ করার কারণ কী হতে পারে?

ঘ. কী করলে রানা নিজের অবস্থা নিয়ে শঙ্কিত হবে না বলে তোমার মনে হয়?

দীপা ও রানার ঘটনাগুলো আমরা পড়লাম। আমাদের মতো করে উত্তরও লিখলাম। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে আমাদের বয়ঃসন্ধিকালের ওপর কার্টুন দেখাবেন। সেটি না পারলে নানা উৎস থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবেন। এর পাশাপাশি এই বই থেকেও কিছু সহায়ক তথ্য জেনে নেওয়া যাক। এই তথ্যগুলো আমাদের কাজে লাগবে।

কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন বিষয়ে সহায়ক তথ্য ও ধারণা

বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকাল আমাদের শরীর ও মনের পরিবর্তনের একটি পর্যায়। এটি বিকাশের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেক মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল। যদিও মেয়েদের ৮ থেকে ১৩ বছর বয়সের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন দেখা যায়। ছেলেদের ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা দেয়। এ সময়ে শরীর ও মনে নানা ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে ১০ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত বয়সকালকে বয়ঃসন্ধিকাল হিসেবে গণ্য করা হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে আমাদের মধ্যে দুই ধরনের পরিবর্তন হয়। যেমন :

১. শারীরিক পরিবর্তন

২. মানসিক পরিবর্তন

শারীরিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের যে পরিবর্তন ঘটে, তাই শারীরিক পরিবর্তন। একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারব যে আমাদের মধ্যেও এধরনের কিছু পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। তবে এই পরিবর্তনগুলো সবার জন্য একই সময়ে এক রকমভাবে আসে না। এ বিষয়গুলোকে আমরা সহজভাবে গ্রহণ করব। এই সময়ের প্রধান শারীরিক পরিবর্তনগুলো হলো :

- দ্রুত উচ্চতা বাড়তে থাকে।
- ওজন বাড়ে।
- শরীর দৃঢ় হয়।
- শরীরের গঠন প্রাপ্তবয়স্কদের মতো হয়।
- শরীরের নানা জায়গায় লোম গজায়।
- ত্বক ও চুলে পরিবর্তন আসে।
- মুখমণ্ডলে ব্রণ হতে পারে।
- কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন হয়।

এ ছাড়া ছেলেদের ক্ষেত্রে আরও কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন :

- গলার স্বর ভারী হয়।
- মুখে দাড়ি-গোঁফ গজাতে শুরু করে।
- মাংসপেশি দৃঢ় হয়। বীর্যপাত হয়।

মেয়েদের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। সেগুলো হলো :

- শরীর ভারী হয় ও বিভিন্ন অংশের আকৃতি পরিবর্তন হয়।
- মাংসপেশি সুগঠিত হয়।

- ঋতুস্রাব (মাসিক) শুরু হয়।

মানসিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন, দ্বিধা, কৌতূহল ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এতে মনের যে পরিবর্তন ঘটে তাই মানসিক পরিবর্তন।

- নিকটজনের মনোযোগ, যত্ন, ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হয়।
- একজন আলাদা মানুষ হিসেবে নিজের ব্যক্তিপরিচয়ের ধারণা তৈরি হয় ।
- আবেগপ্রবণতা বাড়ে।
- কিশোর-কিশোরীদের পরস্পরের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি হয়।
- এ সময় মনের মধ্যে নানাধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা কাজ করতে পারে।
- সামাজিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব বাড়ে।
- এ সময়ে অনেকেই নিজের ব্যাপারে খুব সচেতন থাকে। মনে তীব্র আবেগ অনুভব হয়। বারবার অনুভূতির পরিবর্তন যেমন কখনো হাসিখুশি পরক্ষণেই আবার মন খারাপ হতে পারে। হয়তো কোনো দিন মন খুব ভালো আবার পরের দিন মেজাজ খুব খারাপ হতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা এবং সঠিক তথ্য : বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়ের বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। এসব পরিবর্তন সম্পর্কে আগে থেকে কোনো ধারণা না থাকায় তাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। সঠিক তথ্যের অভাবে ভুল ধারণা তৈরি হয়। তাই এই ভুল ধারণা ও সঠিক তথ্যগুলো জানা দরকার।

মাসিক সম্পর্কে ভুল ধারণা	সঠিক তথ্য
এটা এক ধরনের রোগ	এটা শারীরবৃত্তীয় একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া
এ সময়ে কোনো কাজ বা খেলাধুলা করা যাবে না	স্বাভাবিক কাজকর্ম ও খেলাধুলা করাতে কোনো সমস্যা নেই
গোসল করা যাবে না	নিয়মিত গোসল করতে হবে
বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না	বাড়ির বাইরে যেতে কোনো অসুবিধা নেই
এ সময়ে টক, ঝাল, মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া যাবে না	নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে

বীর্যপাত সম্পর্কে ভুল ধারণা	সঠিক তথ্য
বীর্যপাত একটি রোগ	এটা শারীরবৃত্তীয় একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া
যারা কুরুচিকর চিন্তা করে তাদেরই বীর্যপাত হয়	বয়ঃসন্ধিকালে সকল কিশোরেরই বীর্যপাত হয়
এটি শারীরিক দুর্বলতার কারণ	শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই

বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের যত্ন ও পুষ্টি

বয়ঃসন্ধিকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকর থাকতে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের কিছু কাজ করতে হবে। যেমন :

- **নিয়মিত গোসল করা :** বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের শরীরে বেশি ঘাম হয়। নিয়মিত সাবান দিয়ে গোসল করলে জীবাণুমুক্ত থাকা যায়। এর পাশাপাশি নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা ও হাত-পায়ের নখ ছোট রাখা দরকার। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিষ্কার করা দরকার। এছাড়া বাইরে থেকে বাসায় ফিরে হাত-পা-মুখ ধোয়া প্রয়োজন।
- **পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরা :** সবসময়ই পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করা উচিত। স্কুল থেকে ফিরে দ্রুত স্কুলের পোশাক খুলে ফেলা উচিত। পোশাক ময়লা হলে অবশ্যই তা ধুয়ে পরা উচিত। এসব সাধারণ যত্নের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের শরীরের বিষয়ে কিছু বিশেষ যত্নও নেওয়া দরকার।
- **বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের শরীরের যত্ন :** মাসিকের সময় সাধারণত পরিষ্কার কাপড়, তুলা বা স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এগুলো ব্যবহারের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।
- মাসিকের সময় সম্ভব হলে স্যানিটারি ন্যাপকিন, সম্ভব না হলে পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করা।
- ব্যবহৃত কাপড় বা স্যানিটারি ন্যাপকিন দিনে ৩-৫বার পরিবর্তন করা।
- ধোয়া কাপড় অবশ্যই রোদে, বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে শুকানো। কড়া রোদে শুকালে রোগজীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা কমে যায়। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, ঝোপঝাড় বা গাছে এই কাপড় শুকানো অস্বাস্থ্যকর। সেক্ষেত্রে সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যায়।
- মাসিক শেষ হলে কাপড়গুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে, শুকিয়ে, ভাঁজ করে প্লাস্টিক বা কাপড়ের ব্যাগে ঢুকিয়ে পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য রাখা যায়। ব্যবহার শেষে কাগজে মুড়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে অথবা গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। কোনোভাবেই ব্যবহার করা কাপড় বা প্যাড ল্যাট্রিন বা ড্রেন/নালায় ফেলা যাবে না।
- অতিরিক্ত কাপড় বা প্যাড কাগজে মুড়ে স্কুল ব্যাগে রেখে দেওয়া যেতে পারে। হঠাৎ স্কুলে থাকাকালীন মাসিক শুরু হলে এটি সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কারও কারও ক্ষেত্রে মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হতে পারে। সেক্ষেত্রে তলপেটে গরম পানির সেক দেওয়া যেতে পারে। তবে বেশি ব্যথা হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের শরীরের যত্ন : বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের শরীরে বীর্য উৎপাদন শুরু হয়। শরীরের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বীর্য কখনো কখনো আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে। আমাদের সমাজে এ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার আছে। এসব কুসংস্কারের ফলে অনেকের মধ্যে মানসিক চাপ তৈরি হয়। এটা নিয়ে ভয় পেলে বিভিন্ন মানসিক সমস্যাও তৈরি হতে পারে। কিন্তু এটি স্বাভাবিক বিষয়। এজন্য নিয়মিত গোসল করা এবং শরীর পরিষ্কার রাখা দরকার।

বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যের অভ্যাস

সুস্থ শরীর ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্যের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হয়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েরা দ্রুত বেড়ে ওঠে। তারা পড়াশোনা, খেলাধুলা ও দৌড়ঝাঁপে মেতে থাকে। এ কারণেই তাদের বেশি শক্তির প্রয়োজন।

- বয়ঃসন্ধিকালের সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। পাশাপাশি সঠিক পরিমাণ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- কেউ যদি আগে থেকেই অপুষ্টিতে ভোগে, তাহলে এই সময় শারীরিক নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সব ধরনের পুষ্টিকর খাবার বিশেষ করে আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। যেমন : কচুশাক, লালশাক বা কলিজা ইত্যাদি।
- মাসিকের সময় টক খাবার খাওয়া যাবে না ধারণাটি ঠিক নয়। বরং লেবু, কমলা, আমলকী ও জলপাইয়ের মতো টক জাতীয় ফল এবং ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ অন্যান্য ফল খেতে হবে।
- এ সময় বেশি পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

বয়ঃসন্ধিকালে মনের যত্ন : বয়ঃসন্ধিকালে মনের যত্নের জন্য সঠিক তথ্য জানা দরকার। এ সময় কিশোর-কিশোরীদের তীব্র আবেগ ও অনুভূতি হয়। এটি স্বাভাবিক। এ তথ্যটি তাদের অহেতুক ভয় কিংবা দুশ্চিন্তা দূর করবে। দায়িত্ব গ্রহণে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। ইতোমধ্যে প্রথম অধ্যায়ে মন ভালো রাখার কিছু কৌশল আমরা শিখেছি। বয়ঃসন্ধিকালে মনের যত্নেও সে কৌশলগুলো ব্যবহার করতে পারব। এছাড়াও হঠাৎ রেগে গেলে নিচের কয়েকটি কাজ করা যায় :

- ৩-৫বার নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নেওয়া ও ধীরে ধীরে ছেড়ে দেওয়া।
- ৫০-১ পর্যন্ত উল্টাভাবে গোনা।
- যে স্থানে রাগ হচ্ছে সে স্থান পরিবর্তন করা।
- বেশি পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলা।
- ছবি এঁকে অনুভূতির প্রকাশ করা।
- নির্ভরযোগ্য কারও বা বিশ্বস্ত কারোর সঙ্গে মনের কথা খুলে বলা।

কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সম্পর্কে আমার ধারণা : ফিরে দেখি

এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে আমরা 'বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সম্পর্কে আমার ধারণা' ছকটি পূরণ করেছিলাম। এরপর কমিক, কেস, কার্টুন, নানা তথ্য উৎস ও এই বই থেকে অনেক কিছু জেনেছি। এই নতুন ধারণাগুলো কাজে লাগিয়ে নিচের ছকটি আবার পূরণ করি।

বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সম্পর্কে আমি কী জানি?
আমার শরীরের পরিবর্তন সম্পর্কে এখন যা জানি
আমার মনের নতুন ভাবনাগুলো সম্পর্কে এখন যা জানি

কৈশোরের যত্নে আমার পরিকল্পনা

উপরের বিষয়গুলো থেকে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি আসলে আমাদের জীবন হলো একটা ভ্রমণ কাহিনির মতো। নিজেকে তাই শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও ভালো রাখতে চেষ্টা করব। এজন্য আমরা কী কী করতে পারি তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলি। লক্ষ রাখব আমাদের পরিকল্পনায় যেন শারীরিক ও মানসিক দুটি বিষয়ই গুরুত্ব পায়। চাইলে এ কাজটি গল্প, ছড়া, বন্ধুর কাছে ব্যক্তিগত চিঠি আকারেও আমরা নিচের ছকে লিখতে পারি। এই ছকটি পূরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের পরামর্শ নিতে পারি। বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন এমন কারও কাছ থেকেও সহায়তা নিতে পারি। পরিকল্পনা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাব। তাঁর পরামর্শ নিয়ে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করব।

কৈশোরের সুস্বাস্থ্যের চর্চা

এই অধ্যায়ের কাজগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা বয়ঃসন্ধিকালে বা কৈশোরে সুস্বাস্থ্যের উপায়গুলো পেয়ে গেছি। এখন চর্চা করার পালা। এই বছরের বাকি সময় জুড়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কাজগুলো করব। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ বা চর্চাগুলো ব্যক্তিগত ডায়েরি বা জার্নালে লিখব। নির্দিষ্ট সময় পরপর কাজের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে শিক্ষককে দেখিয়ে নেব। ডায়েরি বা জার্নালে নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে লেখার চেষ্টা করব।

- গত এক/দুই মাসে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কাজগুলো করেছি?
- কাজগুলো করতে কেমন লেগেছে?
- এই কাজগুলো আমাকে ভালো থাকতে কীভাবে সাহায্য করছে? (সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত বোধ করছি কি?)
- কাজগুলো করতে গিয়ে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি কি? হয়ে থাকলে কীভাবে তা মোকাবিলা করেছি?
- শিক্ষক বা পরিবারের কাছে কি আমার কোনো সাহায্য দরকার? সেগুলো কী?

মনে রাখব এটি শুধু এক বছরের বিষয় নয়, বরং পুরো কৈশোরের। এই বছরে আমরা সুস্বাস্থ্যের জন্য অভ্যাস গড়ে তুলব। সেটি আমাদের কৈশোরকাল জুড়ে সুস্বাস্থ্যের পথ দেখাবে।

এই অধ্যায়ের সেশনগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বয়ঃসন্ধিকালীন সুস্বাস্থ্যের পথের অভিযাত্রার পরিকল্পনা করতে পারার জন্য রইল অভিনন্দন। সামনের দিনগুলোতে সুস্বাস্থ্যের চর্চা বজায় রাখার জন্য শুভকামনা থাকল।

আমার অগ্রগতি, আমার অর্জন

নিচের ছকগুলো শিক্ষক পূরণ করবেন। এর মাধ্যমে আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দিবেন। উৎসাহ দেবেন। কীভাবে আরও ভালো করতে পারি সেই উপায় জানাবেন। শিখন কার্যক্রমে উপর ভিত্তি করে আমার কাজগুলোর মান অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।

ছক ১ : আমার অংশগ্রহণ ও এই বইয়ে করা কাজ

	সেশনে আমার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ	অংশগ্রহণের সময় অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাশীল আচরণ	এই বইয়ে করা কাজগুলোর মান
শিক্ষকের মন্তব্য ও পরামর্শ			

ছক ২ : আমার বয়ঃসন্ধিকালীন সুস্বাস্থ্য চর্চা

	আমার করা পরিকল্পনাটির মান	পরিকল্পনা অনুযায়ী করা চর্চা বা কাজগুলো জার্নালে লেখা	চর্চা বা কাজগুলোতে বয়ঃসন্ধিকালের যত্নের সঠিক ধারণাগুলোর প্রতিফলন
বর্ণনামূলক ফিডব্যাক			

চলো বন্ধু হই

বন্ধুর সাথে সময় কাটাতে কার না ভালো লাগে, তাই না? কী করি আমরা বন্ধুদের সাথে? সব বন্ধু কি একরকম প্রিয়? কেউ একটু বেশি প্রিয়, তার সাথে আমরা মনের কথা বলি। খুশির কিছু ঘটলে কখন তা বন্ধুকে বলব, মন ছুটে যায়। আবার কোনো ঘটনায় আঘাত পেলে, কারও ওপর রাগ হলে আর কাউকে বলতে না পারলেও তাকে বলি।

বিভিন্ন সময়ে আমরা নতুন নতুন মানুষের বন্ধু হই। এরকম আমরা যদি কারও প্রিয় বন্ধু হতে পারি তবে কেমন লাগবে বলত? এবার আমরা নতুন একজনের বন্ধু হওয়ার জন্য কিছু কাজ করব, যাতে আমি তার একজন 'প্রিয় বন্ধু' হতে পারি। প্রথমে এমন একজনকে বেছে নেব যার সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে। কীভাবে আমরা বন্ধু হলাম, বন্ধুত্বের জন্য কী করেছিলাম, সেগুলো খুঁজে বের করব। এরপর আমরা সবাই মিলে সবার কাছ থেকে আমাদের বন্ধু হওয়ার গল্প শুনব। তারপর প্রিয় বন্ধু হওয়ার জন্য কী কী করা দরকার, সেসব জেনে আমরা নতুন একজনের 'প্রিয় বন্ধু' হব।

প্রিয় বন্ধু হওয়ার গন্তব্যে পৌঁছাতে আমরা ছয়টি ধাপ পার হব। শেষ ধাপে গিয়ে নতুন একজনের প্রিয় বন্ধু হব। এরপর নতুন বন্ধুকে নিয়ে এই পথটি সুন্দরভাবে পাড়ি দেওয়ার আনন্দ উদ্‌যাপন করব।

আমার বন্ধু

আমার বন্ধুর গল্প

এবার আমরা নিজেদের বন্ধুর গল্প বলব। তার কোন দিকগুলো আমার ভালো লাগে, কেন আমি তাকে বন্ধু মনে করি, সেই গল্পটি বলব। তবে গল্পটি বলব ছবিতে ছবিতে। নিচে আমার গল্পের ছবিটি আঁকি।

আমার বন্ধু কেন আমার প্রিয়?

আমরা আমাদের বন্ধুর গল্প শুনলাম। গল্প শুনে বুঝতে পারলাম, আমরা সবাই বন্ধুকে অনেক ভালোবাসি। সবার কাছেই নিজের বন্ধুটি অনেক প্রিয়। বন্ধুটি কেন আমার এত প্রিয়? সে কী কী করে বলে আমার প্রিয়? এসো আমরা একটু ভাবি। খুঁজে পেলে নিচের ছকে লিখি।

‘আমার বন্ধু কেন আমার প্রিয়’	
কারণ	**এতে আমার কেমন লাগে**
সে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনে	শান্তি পাই, নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়

আমরা ভেবে বের করলাম আমার বন্ধু আমার কাছে কেন প্রিয়। এবার আমরা সহপাঠীদের কাছ থেকে শুনব প্রিয় বন্ধু তাদের কাছে কেন প্রিয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রিয় বন্ধু হওয়ার উপায়

আমরা প্রথমে নিজের বন্ধু কী কী কারণে প্রিয়, তা বের করেছি। এরপর সহপাঠীদের কাছ থেকে তারা কী কী কারণে তাদের বন্ধুদের পছন্দ করে, তাও জানলাম। আমরা সবাই প্রিয় বন্ধু হওয়ার অনেকগুলো উপায় খুঁজে পেলাম।

তাহলে আমরা বোঝাতে পারলাম বন্ধুত্ব তৈরি করতে যে আচরণগুলো সাহায্য করতে পারে সেগুলো হলো :

- বন্ধুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা।
- তার অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করা। আমি তাকে ঠিকভাবে বুঝেছি কি না, প্রয়োজনে তার কাছ থেকে শুনে নেওয়া।
- তার অনুভূতিকে সম্মান করা। তাকে দোষারোপ না করা।
- সে কোনো ভুল কাজ করে ফেললেও দোষারোপ না করা। তাকে কিছু বলার প্রয়োজন হলে তার মন ভালো হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। পরে বুঝিয়ে বলা।
- তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-কষ্টে আমার কেমন লাগে, সেটি তার কাছে প্রকাশ করা।
- তার কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন কি না, তা জানতে চাওয়া। সাধ্যমতো তাকে সহযোগিতা করা। তবে বলতে না চাইলে জোর না করা।
- অনুমতি নিয়ে তার কাছে যাওয়া বা কিছু করা। অনুমতি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
- সে কষ্ট পেতে পারে বা লজ্জা পেতে পারে এমন কথা না বলা ও কাজ না করা।
- নিজে কোনো ভুল আচরণ করলে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া।

বন্ধুরা এ আচরণগুলো করলে আমাদের ভালো লাগে। আমাকে বুঝে তারা পাশে থাকে বলে আমাদের মন ভালো হয়ে যায়। আমরা আনন্দ পাই। আমাদেরকে ভালোবাসে বলেই তারা আমাদের কষ্ট দিতে চায় না। তাদের অনুভূতি ও আচরণ দিয়ে আমরা উপকৃত হই। তাদের এই মনোভাবকে সহমর্মিতা বলে। সহমর্মী হলে একে অপরের প্রতি সম্মানবোধ ও সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়। সম্পর্কের মধ্যে ভালো লাগা কাজ করে। ফলে দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদ কমে যায়।

আমরা সহমর্মিতা ও তার সুবিধা সম্পর্কে জানলাম। এবার আমার সহমর্মী আচরণ ছকে নিজের পাঁচটি সহমর্মী আচরণ লিখি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমার সহমর্মী আচরণ
১।
২।
৩।
৪।
৫।

সহমর্মিতার অভাবে আমরা অন্যদের অনুভূতি ও প্রয়োজন বুঝতে পারি না। অন্যের অনুভূতি, প্রয়োজন ও পরিস্থিতি ঝার চেষ্টা না করেই কোনো কথা বলে ফেলি। কখনো দুষ্টুমি করে এমন কিছু বলে বা করে ফেলি, যা তাদের মনে কষ্ট দেয়। ভাই-বোন, আত্মীয়, সহপাঠী, বন্ধুর সাথেও মাঝে মাঝে আমরা এমন আচরণ করি। এ ধরনের আচরণে কষ্ট পেয়ে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। সবার সাথে মিশতে পারে না। কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। এতে তাদের পক্ষে বন্ধুত্ব তৈরি করা, পড়াশোনা, এমনকি অন্যান্য কাজে মনোযোগ দিতে সমস্যা হয়। কারও কারও মধ্যে বড় হলেও এই সমস্যা থেকে যায়। মা-বাবার অনুভূতি ও পরিস্থিতি না বুঝে এমন কিছু বলি বা করি যা তাদের মনে কষ্ট দেয়।

এবার আমরা পরের পৃষ্ঠার ছবিটি মনোযোগ দিয়ে দেখি। সময় নিয়ে চিন্তা করি ছবিগুলো দেখে আমার কী মনে হচ্ছে?

উপরের ছবিটি নিয়ে প্রথমে নিজে ভাবলাম, তারপর সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করলাম। কোন কোন পরিস্থিতিতে কী কী ভাবে বন্ধু হওয়া যায় এবং সহমর্মী আচরণ করা যায় তার ধারণা পেলাম।

ছবির সাথে আমার কাজে কি কোনো মিল আছে? ছবিগুলো দেখে এমন কোনো কাজের কথা মনে হচ্ছে, যা আমি এখন থেকে করতে চাই? আমার উত্তরগুলো দিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি।

আমি যে সহমর্মী আচরণগুলো করি	আমি এখন থেকে যে সহমর্মী আচরণগুলো করতে চাই

কে কে আমার বন্ধু হতে পারে?

কখনো কখনো আমরা পরিবার, আত্মীয়, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ছবিতে প্রদর্শিত আচরণগুলো পাই। আবার আমরা নিজেরাও করি। পরিবারের মধ্যেও কারও কারও সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। কারও সাথে হয়তো গভীর বন্ধুত্ব হয়। আবার কারও সাথে কিছুটা কম।

পরিবারের কাকে কাকে আমি বন্ধু মনে করি, আমি কি তা খুঁজে দেখতে চাই? খুব মজা হয়, না? তাহলে যখন মন চাইবে পরিবারের মধ্যে বন্ধুর সাথেই মনের কথা বলতে পারব। আনন্দ শেয়ার করতে পারব। দুঃখ-কষ্টও চাইলে শেয়ার করতে পারব।

এবার আমরা পরিবারের মধ্য থেকে এমন ৩ জনকে খুঁজে বের করি, যাদের সাথে আমি সহমর্মী আচরণ করি। তাদের প্রত্যেকের সাথে আমি কী কী সহমর্মী আচরণ করি নিচের ছকে তা দাগ টেনে দেখাই। যদি একই আচরণ একাধিকজনের সাথে করি, তবে তাদের প্রত্যেকের সাথেই দাগ টেনে দেখাব।

সহমর্মী আচরণ	**পরিবারে আমার বন্ধু (নাম ও সম্পর্ক বা ছবি)**
তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি।	
ভালো কাজের প্রশংসা করি, উৎসাহ দেই।	
তার অনুভূতি ও পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করি। আমি তাকে ঠিকভাবে বুঝেছি কি না, প্রয়োজনে তার কাছ থেকে শুনে নিই।	
তার যে কোনো অনুভূতিকে সম্মান করি। দোষারোপ করি না।	
কোনো ভুল কাজ করে ফেললেও দোষারোপ করি না। তাকে বলার প্রয়োজন হলে তার মন ভালো হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। পরে বুঝিয়ে বলি।	
তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-কষ্টে আমার কেমন লাগে সেটি তার কাছে প্রকাশ করি।	
তার কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন কিনা, তা জানতে চাই। সাধ্যমতো তাকে সহযোগিতা করি। তবে বলতে না চাইলে জোর করি না।	
অনুমতি নিয়ে তার কাছে যাওয়া বা কিছু করি। অনুমতির জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।	
সে কষ্ট পেতে পারে বা লজ্জা পেতে পারে এমন কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত থাকি।	
তার ক্ষতি হতে পারে তেমন কাজ থেকে বিরত থাকি।	
নিজে কোনো ভুল আচরণ করলে তার জন্য ক্ষমা চাই।	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ওপরের ছকের কাজটির মাধ্যমে আমরা পরিবারে আমাদের বন্ধু পেয়ে গেলাম। ঐ তিনজনের মধ্যে কার সাথে কেমন বন্ধুত্ব তার একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। যার সাথে ঐ আচরণগুলোর দাগের সংখ্যা বেশি তার সাথে আমাদের বন্ধুত্ব তত গভীর। পরিবারের মধ্যে যে তিনজন বন্ধু খুঁজে পেয়েছি তাদের সাথে কি বন্ধুত্ব আরও বাড়াতে চাই? তাদের সাথে এখন যে আচরণগুলো করছি না তার মধ্যে থেকে কিছু আচরণ যোগ করে বন্ধুত্ব বাড়াতে পারি।

আমরা বন্ধুদের কাছ থেকে ভালোবাসা পাই। তারা আমাদের পাশে থাকে। আমরা তাদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হই। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি থেকেও আমরা অনেকভাবে উপকৃত হই। মানুষ ছাড়াও আলো-বাতাস, পানি, গাছপালা, পশু-পাখি এসব প্রকৃতির উপাদান। গাছপালা, পশু-পাখি কি আমাদের বন্ধু? এবার আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখি।

বৃক্ষদল

প্রাণিদল

বৃক্ষদল ও প্রাণিদল বলেছে কেন তারা নিজেদেরকে আমাদের বন্ধু দাবি করে। আমরা বুঝলাম ওরা কেন আমাদের বন্ধু। আমরা কি নিজেদেরকে ওদের বন্ধু দাবি করতে পারি? আমরা কী করি আমাদের এই বন্ধুদের জন্য?

এবার দেখে নিই আমরা কী কী করি গাছপালা, পশু-পাখির জন্য। এদের জন্য আমরা যে আচরণগুলো করি এবং যেগুলো করতে চাই সেগুলো অপর পৃষ্ঠার বক্সে লিখি। তাহলে আমরা দেখতে পাব কোন কোন সহমর্মী আচরণের জন্য আমরা নিজেদেরকে তাদের বন্ধু দাবি করতে পারি।

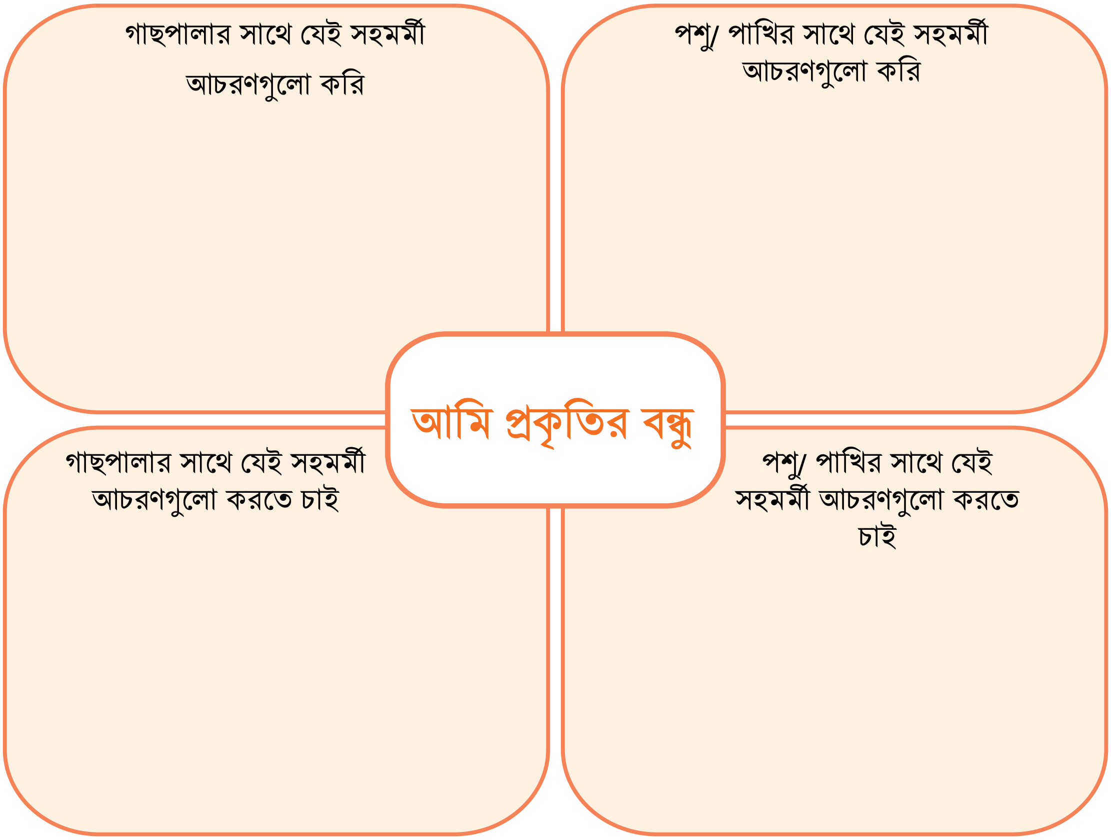

আমরা এই প্রকৃতিতে বাস করি, তার প্রত্যেকটি উপাদান আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। আলো, বাতাস, মাটি, পানি, উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। এরা আমাদের জীবনকে সহজ ও সুন্দর করে। আমরা এদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কৃতজ্ঞ থাকব। এদের ধন্যবাদ জানাব। এদের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করব না।

আমি কার প্রিয় বন্ধু হব?

আমরা কয়েক দিন ধরে বন্ধুত্ব তৈরি করার জন্য পথ চলছি। এক এক করে তিনটি ধাপ পার হলাম। আমার বন্ধু কেন প্রিয় তা বের করে প্রথম ধাপ পার হলাম। বন্ধুত্ব মানে কী, তা জেনে দ্বিতীয় ধাপ পার হলাম। কে কে বন্ধু হতে পারে তা বুঝে তৃতীয় ধাপ পার হলাম।

বন্ধু হওয়ার শেষ ধাপে পৌঁছানোর জন্য এখন থেকে আমরা আরও মনোযোগী হব। আর মাত্র তিনটি ধাপ পার হলেই ছুঁয়ে ফেলব আমার বন্ধু হওয়ার গন্তব্য। হয়ে যাব নতুন একজনের প্রিয় বন্ধু। আমরা সবাই তৈরি তো? তাহলে শুরু করা যাক।

এবার পথ চলা শুরু হলো চতুর্থ ধাপের উদ্দেশ্যে। আমি যার প্রিয় বন্ধু হতে চাই, তাকে খুঁজে বের করব। এমন একজনকে বেছে নেব যার সাথে আমার এখন বন্ধুত্ব নেই। যখন বন্ধু হয়ে যাব তখন আমরা শ্রেণির সবাই মিলে আমাদের নতুন বন্ধুদের নিয়ে একটি উৎসব করব। আমরা তাদের সেই উৎসবে আমন্ত্রণ জানাব। সবাই সবার নতুন বন্ধুর সাথে পরিচিত হব। উৎসব উদযাপন করার জন্য আমরা সবাই পরিকল্পনা করব ও অংশগ্রহণ করব।

প্রিয় বন্ধু হতে কী করব?

প্রিয় বন্ধু হওয়ার জন্য ধাপ অনুযায়ী আমার কাজের একটি পরিকল্পনা তৈরি করব। এই পরিকল্পনাটি তৈরি করতে এবার আরেকবার একবার দেখে নেই কী কী কাজ করলে আমি প্রিয় বন্ধু হতে পারব।

প্রিয় বন্ধু হতে যে সহমর্মী আচরণ করতে চাই

আমি যে সহপাঠীর প্রিয় বন্ধু হতে চাই ফাঁকা ঘরটিতে তার ছবি আঁকি। ছবির পাশে সংক্ষেপে তার পরিচয় ও আমি কেন তার প্রিয় বন্ধু হতে চাই তা লিখি। তবে তার আগে সে আমার প্রিয় বন্ধু হতে চায় কি না জেনে নেই। সে রাজি না হলে অন্য একজনকে বেছে নেই যে আমার বন্ধু হতে চায়।

বন্ধুর ছবি ও পরিচয়	**আমি কেন তার প্রিয় বন্ধু হতে চাই**

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমি কার প্রিয় বন্ধু হব সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেন তারই বন্ধু হব তাও বের করেছি। এবার আমার পরিকল্পনা করার পালা। কী কী কাজ করব বন্ধুত্বের জন্য প্রথমে তা নিচের প্রথম বক্সে লিখব। তারপর যখন বন্ধু হয়ে যাব তখন ২ নম্বর বক্সে বন্ধুকে নিয়ে বন্ধুমেলায় কী করব তার পরিকল্পনা করব। সবশেষে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করতে কী করতে চাই তা ৩ নম্বর বক্সে লিখব।

আমার প্রিয় বন্ধু বানানোর পরিকল্পনা		
১. কী কী কাজ করব বন্ধুত্বের জন্য	২. বন্ধুমেলায় কী করব	৩. বন্ধুত্ব দৃঢ় করতে কী করব

প্রিয় বন্ধু হলাম

আমরা এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বন্ধু হওয়ার কাজ করব। এক মাস পরে আমরা ‘বন্ধুমেলা’ উৎসব করব। উৎসবের দিনে আমার প্রিয় বন্ধুকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব।

আজ .... তারিখ থেকে শুরু হলো আমার পরিকল্পনার কাজ।

.... তারিখ । কী আনন্দ!! আমি পৌঁছে গেলাম শেষ ধাপে। অবশেষে আমি বন্ধু হলাম। ‘প্রিয় বন্ধু’

বন্ধুমেলা

আমার প্রিয় বন্ধু

প্রিয় বন্ধু হতে পেরে আমার অনুভূতি :

প্রিয় বন্ধুর উপহার/ চিঠি	প্রিয় বন্ধুকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি

বন্ধুত্বকে দৃঢ় করতে আমি আর যা করতে চাই :

বন্ধুত্বে সহমর্মিতার চর্চা

এই অধ্যায়ের কাজগুলোর মধ্য দিয়ে সহমর্মিতামূলক আচরণ ও বন্ধুত্বে সেগুলো চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি। এখন চর্চা করার পালা। এই বছরের বাকি সময় জুড়ে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলো করব। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ বা চর্চাগুলো ব্যক্তিগত ডায়েরি বা জার্নালে লিপিবদ্ধ করব। নির্দিষ্ট সময় পরপর কাজের উপর প্রতিবেদন তৈরি করে শিক্ষককে দেখিয়ে নেব। পাশাপাশি শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় পরপর আমাদের সাথে শ্রেণিতে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন। এভাবে চর্চা এবং মতবিনিময় বছরজুড়ে চলবে।

ডায়েরি বা জার্নালে লিপিবদ্ধ করব প্রতিফলন লেখার সময় নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে লিখব।

- গত এক মাসে নতুন দিনলিপি অনুযায়ী কোন কাজগুলো করেছি?
- কাজগুলো করতে কেমন লেগেছে?
- এই কাজগুলো অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি ও রক্ষায় কীভাবে সাহায্য করছে?
- কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি কি? হয়ে থাকলে কীভাবে তা মোকাবিলা করেছি?
- শিক্ষক বা পরিবারের কাছে কি আমার কোনো সাহায্য দরকার? সেগুলো কী?
- মনে রাখব এটি শুধু এক বছরের বিষয় নয়, এই অভিযাত্রা সারা জীবনের। এই বছরে আমরা সহমর্মিতার অভ্যাস গড়ে তুলব।

আমার অগ্রগতি, আমার অর্জন

অপর পৃষ্ঠার ছকটি আমার অভিভাবক ও শিক্ষক পূরণ করবেন। আমি নিজেও পূরণ করব। এর মাধ্যমে আমার অগ্রগতি সম্পর্কে আমি ধারণা লাভ করব। আমি নিজে আমাকে উৎসাহ দেব এবং কোথায় আরও ভালো করার সুযোগ আছে তা খুঁজে বের করব। আমার অভিভাবক ও শিক্ষকও আমাকে স্বীকৃতি দেবেন। কী ভালো করেছি এবং কীভাবে আরও ভালো করতে পারি সেই উপায় জানাবেন। এর মাধ্যমে আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দেবেন। উৎসাহ দেবেন। কীভাবে আরও ভালো করতে পারি সেই উপায় জানাবেন। শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে আমার কাজগুলোর মান অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ছবি ১ : আমার অংশগ্রহণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ে করা কাজ

	অংশগ্রহণের সময় অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে শ্রদ্ধাশীল আচরণ	অংশগ্রহণের সময় অন্য শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ও পরিস্থিতি বোঝার আগ্রহ	বইয়ে সম্পাদিত কাজের মান ও অনুশীলন (শুধু অনুশীলন অংশ অভিভাবক মূল্যায়ন করবেন)
শিক্ষকের মন্তব্য			

ছবি ২ : আমার সহমর্মিতার চর্চা (এই ছকটি শিক্ষক পূরণ করবেন)

	সহমর্মিতার চর্চা সংক্রান্ত পরিকল্পনার যথার্থতা	পরিকল্পনার আলোকে সহমর্মিতার চর্চা সংক্রান্ত অনুশীলনগুলো জার্নালে লিপিবদ্ধকরণ	সহমর্মিতার চর্চা অনুশীলনে সহমর্মিতা সম্পর্কিত ধারণাগুলোর সঠিক প্রতিফলন
বর্ণনামূলক ফিডব্যাক			

	সহমর্মিতার চর্চা সংক্রান্ত পরিকল্পনার যথার্থতা	পরিকল্পনার আলোকে সহমর্মিতার চর্চা সংক্রান্ত অনুশীলনগুলো জার্নালে লিপিবদ্ধকরণ	সহমর্মিতার চর্চা অনুশীলনে সহমর্মিতা সম্পর্কিত ধারণাগুলোর সঠিক প্রতিফলন
বর্ণনামূলক ফিডব্যাক			

চলো নিজেকে আবিষ্কার করি

চলো নিজেকে আবিষ্কার করি- নামটা একটু অন্যরকম লাগছে কি? এ আবার কেমন নাম— নিজেকে আবিষ্কার! মানুষ কতকিছু আবিষ্কার করেছে। যেমন : টেলিফোন, বিদ্যুৎ, ওষুধ আরও কত কি! কিন্তু নিজেকে আবিষ্কার করা— এ আবার কেমন কথা! কিন্তু এবার আমরা সেই কাজটাই করব। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরের কিছু শক্তি বা গুণ আছে। এগুলো আমাকে সবার থেকে আলাদা ও অনন্য করেছে। আবার অন্যদের থেকে আলাদা হয়েও আমরা সমাজের সকলের সাথে মিলেমিশে থাকছি। নিজের কোন কোন বিষয়গুলো জানা থাকা দরকার, কোন বিষয়গুলো আমাকে সাহায্য করবে সমাজে অবদান রাখতে? আমরা এই বিষয়গুলো আবিষ্কার করব। তাহলে চলো শুরু করে দেই নিজেকে আবিষ্কার করার কাজ -

পরের পৃষ্ঠায় কয়েকটি প্ল্যাকার্ড দেওয়া আছে, যেখানে আমরা আমাদের সম্পর্কে লিখব—

এক নজরে আমি

আমার ছবি
আমার নাম
প্রিয় খাবার
প্রিয় খেলা
জন্ম তারিখ
আমার শখ
প্রিয় মানুষ
প্রিয় ফুল
আমার ভালো লাগে যখন কেউ আমাকে
আমার ভালো লাগে না যখন কেউ আমাকে

ঘুরে আসি ফুলের বাগানে

আচ্ছা বলো তো হরেক রকম ফুল দিয়ে সাজানো বাগান দেখতে আমাদের কেমন লাগে? লাল, নীল, হলুদ আরও কত রঙের ফুল! আবার একেক ফুলের সুবাস একেক রকম। কোনো ফুল আকারে ছোট কিন্তু সুবাস অনেক তীব্র। আবার কোনো ফুলের রং অনেক গাঢ় কিন্তু হাল্কা সুবাস। কত ধরনের ফুল, কত প্রকারের সুবাস। বাগানের প্রতিটি ফুল তাদের নিজেদের গুণে বাগানটাকে সুন্দর করার জন্য অবদান রাখছে। আচ্ছা ফুলের কথা কেন হচ্ছে তা কি আমরা বলতে পারি? ফুলের কথা হচ্ছে কারণ আমরা সবাই বাগানের একেকটা ফুল। কত গুণে গুণান্বিত আমরা- আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব গুণ। এই গুণ দিয়ে আমরা সব সময় নিজেদের ও অন্যদের কিছু না কিছু করেই যাচ্ছি। আমরা কেউ কারও মতো নই। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই খুব সুন্দর, প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব পছন্দ, ইচ্ছা ও চাহিদা। এই প্রতিটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু আমি এই বাগানেরই একটি ফুল, তাহলে চলো বাগানের অন্যান্য ফুল অর্থাৎ আমাদের সহপাঠীদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণের সঙ্গে পরিচিত হই এবং নিচের ফুলের ছবিতে তা লিখি। তাদের ধন্যবাদ জানাই যার যার বৈচিত্র্যের জন্য।

আমরা জানলাম আমাদের সবার মধ্যেই কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যদের থেকে আলাদা। আমরা কেউ কখনো সম্পূর্ণভাবে অন্যের মতো না। আমরা একেকজন একেক রকম, এটাই স্বাভাবিক।

ফুলের বাগান তো দেখলাম, এবার আমরা আরও কিছু নতুন বিষয় আবিষ্কার করব। নিচে একটি পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া আছে, আমরা বন্ধুরা মিলে পরিস্থিতিটি পড়ি।

আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য একজন প্রতিনিধি বা ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা হবে। শিক্ষার্থী ক ও শিক্ষার্থী খ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী। শ্রেণি ক্যাপ্টেন হবার জন্য তারা দুজনই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এখন শিক্ষক শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন ক্যাপ্টেন নির্বাচন করার। যেহেতু শ্রেণিতে দুজনই বেশ জনপ্রিয়, তাই শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

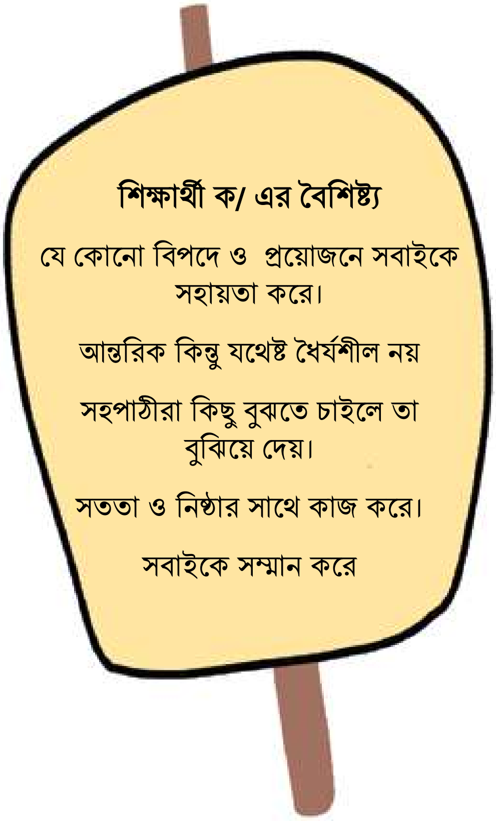

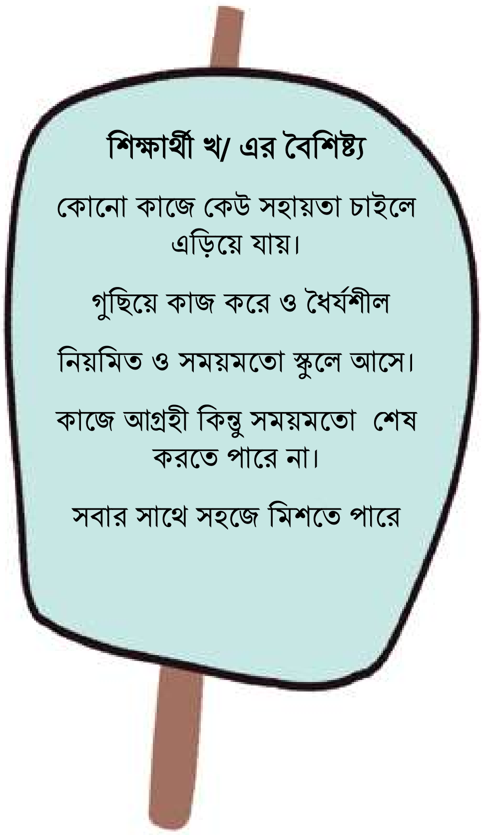

এবার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই :

১। আমি কাকে ক্যাপ্টেন হিসেবে চাইতাম?

-

২। তার কোন কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য আমি তাকে নির্বাচন করতাম এবং কেন?

-

ওপরের ঘটনাটি পড়ে আমরা কি বুঝতে পারছি মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো কী? কোন বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি উপকারী মানুষের জন্য। চলো আরও একটি বিষয় আবিষ্কার করি, তাহলে আমাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে -

শারীরিক ও মানসিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য

মানুষের শারীরিক ও মানসিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরের পৃষ্ঠায় কিছু শব্দ দেওয়া আছে। আমরা নিজের বুদ্ধি, চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে যে ঘরে যেটা প্রযোজ্য সেটা লিখি।

উদার - বলিষ্ঠ - জেদি - আন্তরিক - উচ্চতা - লাজুক - চিন্তাশীল - দয়ালু -স্বার্থপর - পরোপকারী

বাহ্যিক (শারীরিক) বৈশিষ্ট্য	অভ্যন্তরীণ (মানসিক) বৈশিষ্ট্য

ওপরের ছক দুইটিতে আমরা শারীরিক ও মানসিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিখলাম। শারীরিক ও মানসিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য দুটোরই গুরুত্ব আছে। কিন্তু আমরা কি বুঝতে পারছি কোন বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ? মানুষের কোন বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি? তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে, নাকি তার মানসিক বৈশিষ্ট্যকে? শ্রেণিতে আমার পাশে বসা বন্ধুর সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা তার ধারণা সম্পর্কে জানতে পারব। লেখা শেষ হলে নিজেদের জানা আরও কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য যুক্ত করি।

আমার মতে একজন মানুষের প্রয়োজনীয় গুণাবলি

নিচে ছকে মানুষের কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের তালিকা দেওয়া আছে। আর তার নিচে একটি গাছের ছবি দেখতে পাচ্ছি, যেখানে দুই রঙের পাতা আছে, সবুজ ও হলুদ পাতা ।

তালিকায় দেওয়া যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে আমি ইতিবাচক ও প্রয়োজনীয় মনে করি, তা সবুজ রঙের পাতায় লিখি। আর যে বৈশিষ্ট্যগুলো উপকারী বা প্রয়োজনীয় মনে করি না, তা হলুদ রঙের পাতায় লিখি।

চলো, নিজেকে আবিষ্কার করি!

গুণ/বৈশিষ্ট্যের তালিকা

বন্ধুত্বপরায়ণতা, অহংকারবোধ, সাহস, আন্তরিকতা, হিংসা, হাসি-খুশি, সততা, বদমেজাজ, দয়া, সত্যবাদিতা, ভদ্রতা, সহনশীলতা, চিন্তাশীলতা, পরশ্রীকাতরতা, পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা, যত্নশীলতা, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বস্ততা, লোভ, ইতিবাচক মনোভাব, যুক্তিনিষ্ঠতা, পরচর্চা।

আমার নিজের গুণ বা সুপার পাওয়ার

আমার নিজের অনেক প্রয়োজনীয় ও ইতিবাচক গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে। এই সবকটিই হলো একেকটা শক্তি বা পাওয়ার। পূর্বের পৃষ্ঠায় একজন মানুষের যে সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার বলে আমরা মনে করছি তা লিখেছি। আমার মধ্যেও এরকম কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। এই অধ্যায়টি যেহেতু নিজেকে আবিষ্কার করার, তাই নিজের ব্যক্তিগত গুণ বা বৈশিষ্ট্য না জানলে আবিষ্কার তো অসমাপ্ত থেকে যাবে। সেই সাথে কোন কোন গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো চাই সেগুলোও জানতে হবে! কী বল, তাই না? চলো তাহলে আর দেরি না করে নিজের গুণ ও সুপার পাওয়ারগুলো কী কী তা ভেবে বের করি। সেই সাথে আমি আর কোন কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে চাই, ভেবে নিচের ছক দুটি পূরণ করি।

আমি	
আমার কী গুণ বা ভালো বৈশিষ্ট্য আছে	কোন গুণ ও ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো আমি অর্জন করতে চাই
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

চলো, নিজেকে আবিষ্কার করি!

আমার সুপার পাওয়ারগুলো লিখলাম। কোন কোন বৈশিষ্ট্য/পাওয়ার চাই সেটাও লিখলাম। এবার একটু ভাবি এই গুণগুলোকে আমি কীভাবে কাজে লাগাব। ভেবে নিচে লিখি–

অন্যদের চোখে আমি

আচ্ছা, কোনো কাজ করার পর আমি কি আমার কাছের মানুষদের কাছে জানতে চেয়েছি যে "কেমন হয়েছে"? অথবা কেউ কি আমার কোনো কাজের প্রশংসা করেছে? তখন আমার কেমন লেগেছে? বা কেউ আমার কাজকে ভালো না বললে আমার কেমন অনুভূতি হয়? অনেক সময় আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে, আমার কোন কাজটা ভালো হচ্ছে আর কোন কাজটা করা ঠিক হচ্ছে না। তখন আমাদের আশপাশের মানুষ আমাদেরকে জানায় আমাদের ভালো-মন্দ দিকগুলো। তাই চলো নিজের একান্ত কাছের তিনজন মানুষকে বেছে নিই যারা আমার বিষয়ে সঠিক তথ্য দেবে বলে আমি মনে করি। এই তিনজনের একজন আমার পরিবারের একজন, প্রতিবেশী ও একজন কাছের বন্ধু। তাদের কাছ থেকে আমি আমার সম্পর্কে জানব। চলো দেখি তারা কী বলে। সেগুলো নিচের ছকে লিখে ফেলি।

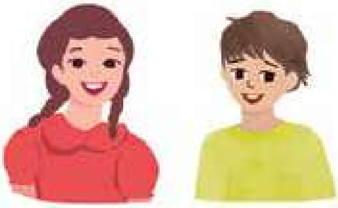

আমি

প্রতিবেশী

পরিবার

বন্ধু

কাছের মানুষের নাম আমি যার কাছ থেকে আমার সম্পর্কে জেনেছি	আমার কোন ভালো গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো আছে	আরও কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো আমার থাকলে ভালো হতো
পরিবারের মধ্যে যার সাথে কথা বলেছি :	১। ২। ৩। ৪।	১। ২।
প্রতিবেশীদের মধ্যে যাদের সাথে কথা বলেছি :	১। ২। ৩। ৪।	১। ২।
প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে যার সাথে কথা বলেছি :	১। ২। ৩। ৪।	১। ২।

চলো, নিজেকে আবিষ্কার করি!

আমার কাছের মানুষগুলো আমাকে জানাল আমার গুণ বা সুপার পাওয়ারগুলোর বিষয়ে। এও জানাল কোন পাওয়ার বা বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার। এরা আমার কাছের মানুষ এবং আমার ভালো চান। আমি এবং আমার কাছের মানুষ আমার মধ্যে যে গুণ বা সুপার পাওয়ারগুলো আবিষ্কার করেছি তা লিখে ফেলি—

একনজরে দেখে নেই আমার সুপার পাওয়ার/গুণগুলো :

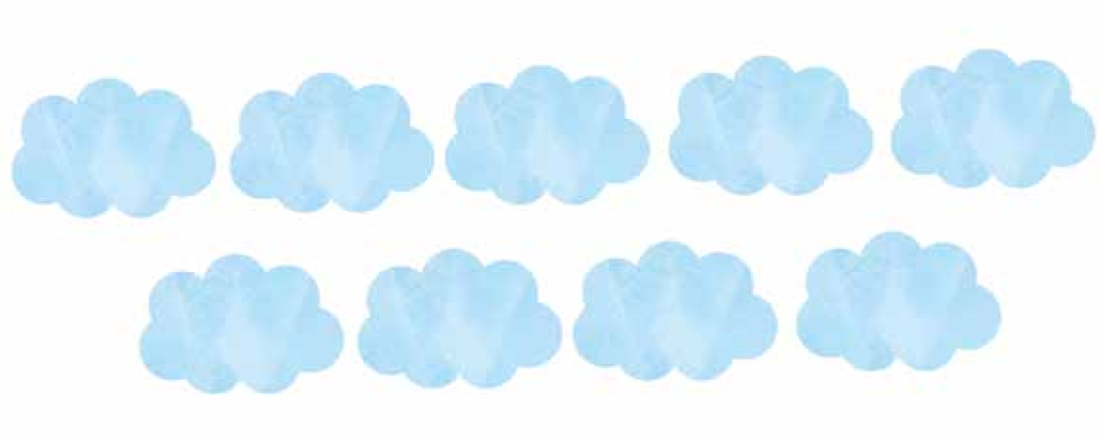

আশা করি নিজের গুণগুলো সম্পর্কে জেনে আমাদের ভালো লেগেছে। এবার ভালো গুণ/বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমার মধ্যে থাকা দরকার বলে আমি ও আমার কাছের মানুষেরা মনে করি, সেখান থেকে দুটো বৈশিষ্ট্য আমি নিজে আমার পছন্দমতো বেছে নেই।

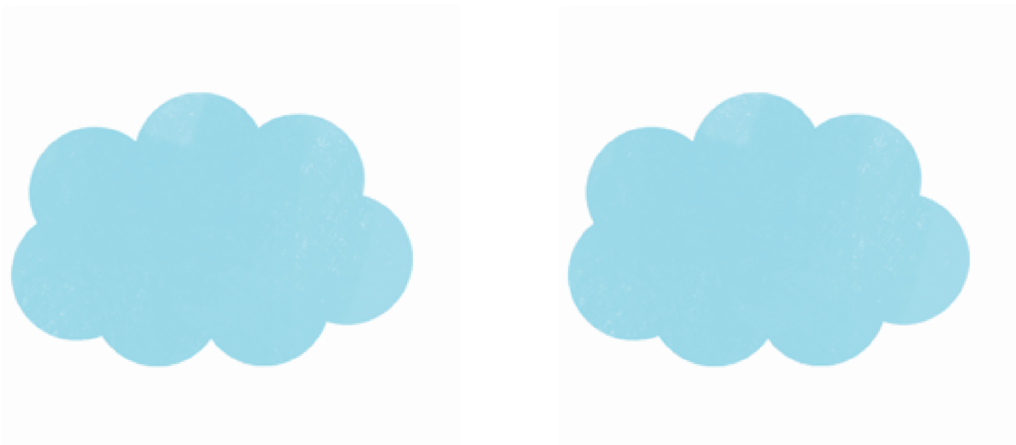

এবার আমরা নিজের একটি ছবি আঁকি যেখানে আমার এই ১টি বা ২টি গুণ কাজে লাগাচ্ছি।

ছবি: নিজের গুণ/সুপার পাওয়ার কাজে লাগানোর ছবি –

আমার গুণ/সুপার পাওয়ার কাজে লাগানোর পরিকল্পনা

আমরা আমাদের গুণ বা সুপার পাওয়ারের কথা জানলাম। আরও জানলাম কোন গুণ বা সুপার পাওয়ারগুলো থাকলে আমাদের জীবন আরও সুন্দর হবে। এই অধ্যায়ের শুরুতে 'একনজরে নিজেকে দেখে নিই' নামে একটি ছক পূরণ করছিলাম। মনে পড়ে, সেখানে 'আমার ভালো লাগে না যখন কেউ আমাকে' নামের একটি ঘর ছিল? সেখানে আমরা দুটি বিষয় লিখেছিলাম এবং আমার অনুভূতির কথাও লিখেছিলাম। এবার আমাদের কাজ হবে, যে গুণ বা সুপার পাওয়ারগুলো আমরা আবিষ্কার করেছি সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে সেইসব পরিস্থিতি মোকাবিলার পরিকল্পনা করা। চলো শুরু করা যাক –

ঘটনা - ১ 'আমার ভালো লাগে না যখন কেউ আমাকে ...' – (এ আমার উল্লেখ করা প্রথম ঘটনা)

এই ওয়ার্কশিটটি ব্যবহার করে আমার গুণ/সুপার পাওয়ার কাজে লাগিয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করব। যেখানে 'আমার ভালো লাগে না যখন কেউ আমাকে ...' (এ আমার উল্লেখ করা প্রথম ঘটনার মতো কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি হলে আমি কেমন ব্যবহার করবো- সেটা নিচে তুলে ধরব) -

যদি কেউ আমাকে ....বলে/করে

তাহলে আমি (যা বলব বা করব) ....

নিরাপদ স্থান (যেখানে আমি যেতে পারি) :

নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি (বয়সে বড় কোনো ব্যক্তি যার সাথে আমি এই বিষয়ে কথা বলতে পারি) :

ঘটনা - ২ 'আমার ভালো লাগে না যখন কেউ আমাকে ...'- (এ আমার উল্লেখ করা দ্বিতীয় ঘটনা)

এই ওয়ার্কশিটটি ব্যবহার করে আমার গুণ/সুপার পাওয়ার কাজে লাগিয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করব। যেখানে 'আমার ভালো লাগে না যখন কেউ আমাকে ...' (এ আমার উল্লেখ করা দ্বিতীয় ঘটনার মতো কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি হলে আমি কেমন ব্যবহার করব)- সেটা নিচে তুলে ধরব–

যদি কেউ আমাকে ....বলে/করে

তাহলে আমি (যা বলব বা করব) ....

নিরাপদ স্থান (যেখানে আমি যেতে পারি) :

নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি (বয়সে বড় কোনো ব্যক্তি যার সাথে আমি এই বিষয়ে কথা বলতে পারি) :

আমার গুণ/সুপার পাওয়ার কাজে লাগানোর চর্চা

আমাদের গুণ বা সুপার পাওয়ার কীভাবে কাজে লাগাব তার পরিকল্পনা খুব সুন্দরভাবে করলাম। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে গুণগুলো আমরা নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারব। নিচের ছকের মতো করে আমার ডায়েরি বা জার্নালে সামনের দুই সপ্তাহ কোন কোন পরিস্থিতিতে এই গুণগুলোর চর্চা করছি, সেটা লিখব এবং শিক্ষককে দেখাব।

পরিস্থিতি বা ঘটনা	গুণ/সুপার পাওয়ার কীভাবে ব্যবহার করেছি	গুণ/সুপার পাওয়ার ব্যবহার করে আমার কেমন লেগেছে

এই অধ্যায়ের সেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। এই গুণ/সুপার পাওয়ারগুলো শুধু এই সময়ের জন্য নয়। এগুলো আমরা সব সময় ব্যবহার করব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমার অগ্রগতি, আমার অর্জন

নিচের ছকগুলো শিক্ষক পূরণ করবেন। এর মাধ্যমে আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দেবেন। উৎসাহ দেবেন। কীভাবে আরও ভালো করতে পারি সেই উপায় জানাবেন। শিখন কার্যক্রমে উপর ভিত্তি করে আমার কাজগুলোর মান অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।

ছক ১ : আমার অংশগ্রহণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ে করা কাজ

	সেশনে আমার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ	অংশগ্রহণের সময় অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাশীল আচরণ	আমার স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ে করা কাজগুলোর মান
শিক্ষকের মন্তব্য ও পরামর্শ			

ছক ২ : আমার গুণ বা সুপার পাওয়ারের চর্চা

	আমার করা পরিকল্পনাটির মান	পরিকল্পনা অনুযায়ী করা চর্চা বা কাজগুলো জার্নালে লেখা	চর্চা বা কাজগুলোতে গুণের সঠিক চর্চা বিষয়ক ধারণাগুলোর প্রতিফলন
বর্ণনামূলক ফিডব্যাক			

অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা বলি

আমাদের মনে অনেক কথাই থাকে। সেসব কথা কখনো বলতে পারি, আবার কখনো বলতে পারি না। কখনো এমন হয় যে আমরা যা অনুভব করছি, বলতে চাচ্ছি, করতে চাচ্ছি তা বলে বা করে উঠতে পারি না। আবার যে কথা কিছু মানুষের কাছে সহজেই বলতে পারি, তা অন্য অনেকের কাছে বলতে পারি না বা প্রকাশ করাটা কঠিন লাগে। কাউকে ভালো লাগলে, বন্ধুত্ব করতে চাইলে, প্রশংসা ও সাহায্য করতে ইচ্ছে হলেও অনেক সময় মুখ ফুটে বলা হয় না। মনে হয় নিজের চাওয়া প্রকাশ করলে অন্যরা কষ্ট পাবে, আমাকে খারাপ ভাববে, আমার কথায় গুরুত্ব দিবে না, আমাকে ভয় দেখাবে বা হেয় করবে। তখন নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে পারি না। কখনো আবার এমন হয় যে একটি কাজ আমরা করতে চাচ্ছি না, কিন্তু 'না' বলতে পারছি না। তখন 'না' বলাটা যেন অনেক কঠিন মনে হয়। এমন অবস্থায় আমাদের অনেকেরই জানতে ইচ্ছা হয় আমি কীভাবে কথা বলব, কীভাবে কথা বললে নিজেকে এবং অন্যকে কষ্ট দেওয়া হবে না আবার একই সাথে নিজের চাওয়া, অনুভূতি এবং মতামত আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রকাশ করতে পারব।

এ কারণেই এই ধাপে আমরা একটা অভিযানের মধ্য দিয়ে যাব। এ অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা অনেকগুলো ঘটনা জানব সেখানে দেখব মনের কথা প্রকাশ করা নিয়ে আমরা কী ধরনের কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই। এই যাত্রায় আমরা নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে আবিষ্কার করব। এ যেন এমন অভিযান যেখানে আমরা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করার মন্ত্র খুঁজে নিচ্ছি।

নিজের কথা যেভাবে প্রকাশ করি

শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী ছোট দলে ভাগ হয়ে যাই। আমরা কীভাবে নিজের ইচ্ছা, চাওয়া, অনুভূতি, মতামত অন্যের কাছে প্রকাশ করি তা ছোট দলে শেয়ার করি। শেয়ার করার আগে নিচের বিষয় দুটি সম্পর্কে ভেবে নেব।

আমার জীবনে ঘটে এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করি যেখানে আমার কোনো চাওয়া বা অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছি না বা প্রকাশ করতে চাই।

- আমার জীবনে ঘটে যাওয়া এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করি যেখানে কারও কোনো আচরণ, কাজ বা কথায় আমার কষ্ট/আঘাত/রাগ লেগেছে।

ওপরের দুটি ঘটনা চিরকুটে লিখে, ছবি এঁকে, অভিনয় বা অন্য কোনো উপায়ে আমার দলে প্রকাশ করতে পারি। দুটি ক্ষেত্রেই আমি কেমন অনুভব করি তা যেন চিরকুট, ছবি, অভিনয় বা অন্য উপায়ে প্রকাশ পায়। দলের সবাই দুটি ঘটনা খুঁজে বের করলে সবাই যার যার দুটি ঘটনায় কী করতে পারি বা বলতে পারি তা শেয়ার করি।

ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে দেখি

নিজের এবং বন্ধুদের কথা তো জানলাম। এবার আরও কিছু পরিস্থিতিতে নিজেকে কল্পনা করে দেখি। এরপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই।

পরিস্থিতি ০১ : আমি দেখলাম আমার বন্ধুরা বিরতির সময়ে খেলছে। আমার মনে হলো যে আমার সাথে খেলতে চায়নি বলে আমায় ডাকেনি ওরা।

এমন পরিস্থিতিতে আমার কেমন অনুভূতি হতো?

এ অবস্থায় আমি কী করতাম এবং বন্ধুদের কী বলতাম?

আমার অন্তত একজন বন্ধুর সাথে আলোচনা করি। এমন পরিস্থিতিতে তার কেমন অনুভূতি হতো এবং সে কী করত?

পরিস্থিতি ০২ : সারাদিন ক্লাস করে এবং স্কুলে একটি অনুষ্ঠান আয়োজনে অংশ নিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরেছি। গিয়ে দেখি বাসায় অনেক মেহমান। তারা যে আসবেন তা আমি আগে থেকে জানতাম না। সেই মুহূর্তে আমার একটু বিশ্রাম নেওয়ার অবস্থা নেই। এ সময় আমার চেয়ে বয়সে বেশ ছোট দুজন শিশু এলো এবং কাগজ দিয়ে কিছু খেলনা বানিয়ে দেবার বায়না ধরল।

এমন পরিস্থিতিতে আমার কেমন অনুভূতি হতো?

এ অবস্থায় আমি কী করতাম এবং শিশুদের কী বলতাম?

আমার অন্তত একজন বন্ধুর সাথে আলোচনা করি। এমন পরিস্থিতিতে তার কেমন অনুভূতি হতো এবং সে কী করত?

পরিস্থিতি ০৩ : অনেক দিন অপেক্ষা করার পরে আমার মা পছন্দের রং পেন্সিলের বক্স কিনে দিয়েছে। আমি বন্ধুদের দেখাতে ক্লাসে নিয়ে এলাম। যেই কাছের বন্ধুদের দেখানোর জন্য এগুলো ব্যাগ থেকে বের করলাম, অমনি এক বন্ধু দুটি রং পেন্সিল হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল।

এমন পরিস্থিতিতে আমার কেমন অনুভূতি হতো?

এ অবস্থায় আমি কী করতাম এবং বন্ধুকে কী বলতাম?

আমার অন্তত একজন বন্ধুর সাথে আলোচনা করি। এমন পরিস্থিতিতে তার কেমন অনুভূতি হতো এবং সে কী করত?

পরিস্থিতি ০৪ : আমি আমার বন্ধুদের সাথে খেলছি। খেলায় খুবই টানটান উত্তেজনাকর অবস্থা। আরেকটু পরেই আমি জিতে যাব। এমন সময় আমার মা এসে খেলা বন্ধ করতে বলছেন। বলছেন এখুনি পড়তে বসতে। আমি যেতে না চাইলে বিরক্ত হয়েছেন।

এমন পরিস্থিতিতে আমার কেমন অনুভূতি হতো?

এ অবস্থায় আমি কী করতাম এবং মাকে কী বলতাম?

আমার অন্তত একজন বন্ধুর সাথে আলোচনা করি। এমন পরিস্থিতিতে তার কেমন অনুভূতি হতো এবং সে কী করত?

পরিস্থিতি ০৫ : আমি শ্রেণিকাজের অংশ হিসেবে সহপাঠীদের সাথে একটি নাটকে অংশগ্রহণ করেছি। নাটকে আমার অভিনয় নিয়ে শিক্ষক যে মতামত দিলেন, তার সাথে আমি একমত নই। আমার মনে হচ্ছে কোথাও কোনো ভুল হয়েছে বা শিক্ষক আমাকে অন্য কারও সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন।

এমন পরিস্থিতিতে আমার কেমন অনুভূতি হতো?

এ অবস্থায় আমি কী করতাম এবং উপরের ক্লাসের শিক্ষার্থীকে কী বলতাম?

আমার অন্তত একজন বন্ধুর সাথে আলোচনা করি। এমন পরিস্থিতিতে তার কেমন অনুভূতি হতো এবং সে কী করত?

এতক্ষণ ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করে আমরা বুঝতে পেরেছি যে পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের অনুভূতি ও আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আমরা এটাও দেখলাম যে, অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন, নিজেদের মনের অবস্থা, আমরা কী চাই ইত্যাদি সবকিছুই প্রভাব রাখে। কখনো কখনো আমাদের চাওয়া, অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করার ধরন অন্যদের সাথে মিলে যাবে। আবার অনেক সময় তা মিলবে না। তবে যেকোনো পরিস্থিতিই হোক না কেন, খেয়াল রাখতে হবে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করলে তা আমার জন্য ভালো হবে; আবার অন্যের ক্ষতি হবে না।

অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা কীভাবে প্রকাশ করব?

নিচের গল্পগুলো পড়ি। গল্পের মাঝে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো নিজে নিজে উত্তর দেই। এরপরে বন্ধুর সাথে আলোচনা করি।

গল্প ১ : ব্যক্তিগত সীমানা

আমরা কি কখনো নিজে নিজে বাবল ফুলিয়েছি?

আমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছি যে বাবলগুলো অনেক স্বচ্ছ এবং সহজে দেখতে পাওয়া যায় না, দূর থেকে প্রায় অদৃশ্য।

আমরা কী খেয়াল করেছি কত সহজে বাবল ফুলানো যায়?

যদি আগে কখনো বাবল না ফুলাই, তাহলে এসো সাবান পানি মাখিয়ে অনেক ফেনা তৈরি করি এবং দুই হাতের তালু একটু ফাঁকা করে ফুঁ দিয়ে বাবল বানাই।

এই বাবলের মতোই প্রতিটি মানুষকে ঘিরে একটি অদৃশ্য বাবল থাকে। সেটি হলো আমাদের ব্যক্তিগত সীমানার বাবল।

এবার একটু দাঁড়াই এবং আমার দুই হাত দুই দিকে মেলে দিয়ে একবার চারপাশে ঘুরি। এভাবে ঘুরতে যতটুকু জায়গা লাগল, সে জায়গাটুকুই হলো আমার ব্যক্তিগত সীমানা ঘিরে থাকা অদৃশ্য বাবল। আমার পাশের সহপাঠীকেও একইভাবে হাত ছড়িয়ে ঘুরতে বলি এবং দেখি তার ব্যক্তিগত সীমানা ঘিরে থাকা অদৃশ্য বাবলের জন্য কতটুকু জায়গা লাগে।

এই ব্যক্তিগত সীমানা ঘিরে থাকা অদৃশ্য বাবল আমাদের প্রত্যেকেরই থাকে।

আমার শরীরের চারপাশে ব্যক্তিগত সীমানা ঘিরে থাকা বাবলে কে প্রবেশ করতে পারবে এবং কে পারবে না তা নির্ধারণ করার সম্পূর্ণ অধিকার আমার। যখন কেউ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যের ব্যক্তিগত সীমানায় ঢুকে পড়ে, তখন এ অদৃশ্য বাবল ফুটে যায়।

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সীমানায় প্রবেশ করার অধিকার কারোরই নেই–হোক সে ছোট, সমবয়সি বা বয়সে বড়।

তাই, কেউ যেন আমার অদৃশ্য বাবল ফুটিয়ে না দেয় সেটি খেয়াল রাখব। একই সাথে আমিও যাতে অন্য কারও সাথে এ কাজ না করি, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকব।

তবে কিছু মানুষ থাকে যাদেরকে এই ব্যক্তিগত সীমানায় প্রবেশ করতে দিতে ভয় বা দ্বিধা থাকে না। যাদের সাথে আমি নিরাপদ ও স্বস্তিবোধ করি, তারা এই ব্যক্তিগত সীমানায় চলে এলেও বাবল ফুটে যায় না। এই নিরাপদ মানুষগুলো হতে পারে আমার পরিবারের সদস্য, বন্ধু, আত্মীয়, শিক্ষক বা অন্য যেকোনো ব্যক্তি।

অনেকেই বিভিন্ন স্পর্শ, আচরণ, বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আমাকে ঘিরে থাকা অদৃশ্য বাবল ফুটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে; ব্যক্তিগত সীমানায় অযাচিতভাবে চলে আসতে পারে। আমি আমার ব্যক্তিগত সীমানায় এমন কাউকে আসতে দিব না যার সাথে নিজেকে নিরাপদ মনে করি না। যার সাথে আমার অস্বস্তি লাগে বা খারাপ কিছু হওয়ার ভয় থাকে। এই অনিরাপদ মানুষগুলো হতে পারে আমার পরিবারের সদস্য, বন্ধু, আত্মীয়, বা অন্য যেকোনো ব্যক্তি।

আমি কারও সাথে নিরাপদ ও স্বস্তিবোধ করছি কি না বোঝার অন্যতম উপায় হলো তারা আমাকে কীভাবে স্পর্শ করে। দুই ধরনের স্পর্শ রয়েছে : নিরাপদ স্পর্শ ও অনিরাপদ স্পর্শ।

নিরাপদ স্পর্শ আমার ব্যক্তিগত সীমানা ঘিরে থাকা অদৃশ্য বাবল ফুটিয়ে দেয় না। নিরাপদ স্পর্শে আমার অস্বস্তি হবে না। নিরাপদ স্পর্শ এমন হতে পারে- আমার মা আমাকে জড়িয়ে ধরল, ক্লাসে ভালো করায় আমার শিক্ষক মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, বিশ্বস্ত বন্ধুর হাত ধরে ঘুরে বেড়ালাম। একেক জনের সাথে নিরাপদ স্পর্শ একেক ধরনের হয়। আমার মা কপালে চুমু দিলেও, আমি হয়তো আমার বন্ধুকে চুমু দিতে দিব না। তবে সে একই বন্ধুর সাথে হাত ধরে ঘুরতে হয়তো আমার অস্বস্তি লাগবে না।

আমার জন্য নিরাপদ স্পর্শ কোনগুলো হতে পারে তা নিচে লিখি। আমার বন্ধুর সাথে উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করি এবং আলোচনা শেষে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অনিরাপদ স্পর্শ একদমই ঠিক না। কারো অধিকার নেই আমাকে অনিরাপদভাবে স্পর্শ করার। অনিরাপদ স্পর্শ আমার শরীর ও মনকে কষ্ট দেয় এবং আমার ব্যক্তিগত সীমানা ঘিরে থাকা বাবল ফুটিয়ে দেয়। অনিরাপদ স্পর্শ হলো যখন কেউ আমাকে আঘাত করে বা এমনভাবে স্পর্শ করে যার জন্য আমি অস্বস্তিবোধ করি। এ কাজ যে কেউই করার চেষ্টা করতে পারে, হোক সে আমার ছোট, সমবয়সি বা বয়সে বড়। মনে রাখব, আমাকে কেউ অনিরাপদভাবে স্পর্শ করলে সে দোষ কখনোই আমার না।

আমার জন্য অনিরাপদ স্পর্শ কোনগুলো হতে পারে তা নিচে লিখি। আমার বন্ধুর সাথে উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করি এবং আলোচনা শেষে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে করি।

কিছু মানুষ থাকতে পারে যারা আমার ব্যক্তিগত সীমানা ঘিরে থাকা বাবলকে গুরুত্ব দিতে চাইবে না। যদি কেউ (আমার খুব কাছের এবং ভালোবাসার মানুষ বা অন্য কেউ) আমাকে আঘাত করে, বা অস্বস্তিকরভাবে স্পর্শ করে, তাকে দৃঢ়ভাবে না বলার অধিকার আমার আছে।

আমি না বলার পরেও কেউ আমার ব্যক্তিগত সীমানা ঘিরে থাকা বাবল ফুটিয়ে দিতে চেষ্টা করতে পারে। এক্ষেত্রে আমি নিরাপদ বোধ করি ও বিশ্বাস করি এমন কাউকে এ বিষয়টি জানাব। যদি সে মানুষটি আমার কথা বিশ্বাস না করে বা গুরুত্ব না দেয়, তাহলে আরেকজন বিশ্বস্ত মানুষকে খুঁজে বের করব যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

যদি আমি অনিরাপদ বোধ করি বা যেকোনো বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য নিতে পারি। নিচের নম্বরগুলোতে ফোন করলে আমি সাহায্য পাব :

১) শিশু সুরক্ষা বিষয়ক নম্বর : ১০৯৮

২) জরুরি সেবা নম্বর : ৯৯৯

গল্প ২ : সহমর্মিতা

স্থান : নদীর পাড়।

চরিত্র : কিংশুক চাকমা, রাজিন রহমান ও সীমান্ত পাল।

কিংশুক চাকমা, রাজিন রহমান ও সীমান্ত পাল তিন বন্ধু। নদীতে গোসল করা নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা চলছে।

কিংশুক : আমরা কিন্তু আজকে নদীতে নামবই সীমান্ত। আমাদের কিন্তু আগেই এ নিয়ে কথা হয়েছে।
সীমান্ত : আমি কোনো পানিতে নামার মধ্যে নেই। আমি সাঁতার পারি না।
কিংশুক : নদীর পাড়ে এসেও পানিতে নামবে না ! হে হে হে! তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।

সীমান্ত : না হলে নাই। আমি নামছি না।
রাজিন : আরে কিছু হবে না সীমান্ত। তোমাকে তো সাঁতার কাটতে হবে না, শুধু কোমর পানিতে নামলেই হবে।
কিংশুক : আসল কথা হচ্ছে ও একটা ভীতুর ডিম। ওর কলিজা হচ্ছে মুরগির সমান।

কিংশুক : তুমি না নামলে নাই, আমি আর রাজিন নামছি।
সীমান্ত : আচ্ছা তোমরা নামো, আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। (মন খারাপ চেহারা নিয়ে)।
রাজিন : আজকে নদীতে না নামলে কিন্তু আমিও তোমাকে ভীতুর ডিম বলব সীমান্ত (রাজিন এ কথা বলার চিন্তা করছে কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেল)।

রাজিনের মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় একবার দাদাবাড়ি বেড়াতে গিয়ে বাগানে গেলে মৌমাছি কামড় দেয়। এরপর থেকেই বাগান দেখলেই তার ভয় লাগত এবং তার মামাতো ভাই এ নিয়ে তাকে ভীতুর ডিম বলে খেপাত।

রাজিন : সাঁতার না জানলে পানিতে ভয় লাগাই স্বাভাবিক। আমি যখন সাঁতার পারতাম না, আমারও পানি নিয়ে ভয় ছিল।

কিংশুক : রাজিন অবশ্য ঠিকই বলেছ। আচ্ছা থাক সীমান্ত। তোমার পানিতে নামতে হবে না।

রাজিন: আমি ভেবেছিলাম গোসল শেষে আমরা একসাথে বাড়ি যাব। আমাদের গোসল শেষ হওয়া পর্যন্ত কি একটু অপেক্ষা করবে সীমান্ত?
সীমান্ত : আচ্ছা ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করব। আমারও তোমাদের সাথে বাড়ি ফিরতে পারলে খুশি লাগবে।

গল্প অনুযায়ী কোন চরিত্রের সাথে নিচের কথাগুলো মিলে তা নিয়ে চিন্তা করে হ্যাঁ/না/প্রযোজ্য নয় লিখি। আমার বন্ধুর সাথে ছকটি নিয়ে আলোচনা করি এবং আলোচনা শেষে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে করি।

চরিত্র	নিজের অনুভূতি ও প্রয়োজন চিহ্নিত করতে পেরেছে	অন্যের অনুভূতি ও প্রয়োজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল	প্রয়োজনে দৃঢ়ভাবে না বলতে পেরেছে	দৃঢ়ভাবে নিজের অনুভূতি প্রয়োজন ও মতামত প্রকাশ করতে পেরেছে
কিংশুক				
সীমান্ত				
রাজিন				

নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে উত্তর তৈরি করি। বন্ধুর সাথে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করি এবং আলোচনা শেষে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে করি।

প্রশ্ন	উত্তর
সীমান্ত নিজের অনুভূতি ও চাওয়া প্রকাশ করতে কিংশুক ও রাজিনের সাথে কীভাবে কথা বলতে পারত?	
কিংশুক কীভাবে রাজিনের সাথে কথা বলতে পারত?	
রাজিনের জায়গায় আমি থাকলে আর কী কী করতে পারতাম?	

গল্প ৩ : নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করি

স্থান : বাজারের একটি দোকান

চরিত্র : জিনিয়া, রেহানা খাতুন (জিনিয়ার মা), খায়রুল হাসান (জিনিয়ার বাবা)

জিনিয়া তার বাবা-মায়ের সাথে বাজারের একটি দোকানে ঈদের জামা কিনতে এসেছে।

মা : আমাদের আজকে আরও অনেক কাজ আছে জিনিয়া। তাই জলদি কেনাকাটা সারতে হবে।
জিনিয়া : আচ্ছা, মা।

বাবা : জিনিয়া তুমি দেখো কী ধরনের জামা তোমার ভালো লাগে, এই দোকানে অল্প দামে বেশ ভালো ভালো জামাকাপড় আছে।

মা : ও সহজে কিছু পছন্দ করতে পারে না, অনেক সময় নষ্ট করবে। আমি দেখে দিচ্ছি। এই নীল জামাটা সুন্দর, জিনিয়া দেখ তো এটা গায়ে লাগবে কি না। (মায়ের এ কথা শুনে জিনিয়ার চেহারা মলিন হয়ে যায়)

জিনিয়া : আমার বন্ধু শিউলি বলেছিল কালো রঙে আমাকে অনেক সুন্দর লাগে।

কিন্তু মা বলে কালো রং ভালো না। আমি মাকে কিছু

বলতে পারি না, ভয় লাগে। না, থাক। মাকে আমি এ নিয়ে এখন রাগাতে চাই না। যেটা কিনতে বলবে সেটাই নেব।

বাবা : জিনিয়া এই জামা ঠিক আছে? তাড়াতাড়ি বলো আমাদের অনেক কেনাকাটা আছে।

জিনিয়া : কি! (সংবিত ফিরে পেয়ে)। ঠিক আছে সমস্যা নেই।

মা : পছন্দ হয় নাই? আমি জানি তোমাকে কী সুন্দর লাগবে এই জামায় !

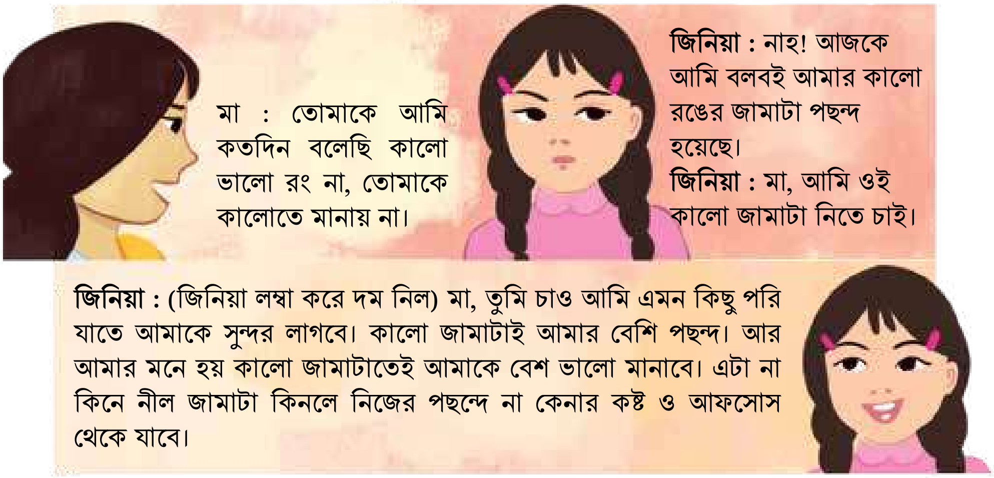

গল্প অনুযায়ী কোন চরিত্রের সাথে নিচের কথাগুলো মিলে তা নিয়ে চিন্তা করে হ্যাঁ বা না লিখি। আমার বন্ধুর সাথে ছকটি নিয়ে আলোচনা করি এবং আলোচনা শেষে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে করি।

চরিত্র	নিজের প্রয়োজন ও অনুভূতি চিহ্নিত করতে পেরেছে	অন্যের প্রয়োজন ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল	প্রয়োজনে দৃঢ়ভাবে না বলতে পেরেছে	দৃঢ়ভাবে নিজের প্রয়োজন, অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করতে পেরেছে
জিনিয়া				
রেহানা				
খায়রুল হাসান				

নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে উত্তর তৈরি করি। আমার বন্ধুর সাথে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করি এবং আলোচনা শেষে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে করি।

প্রশ্ন	উত্তর
জিনিয়ার জায়গায় আমি থাকলে আর কী কী উপায়ে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাতাম?	
আমার পছন্দ-অপছন্দ আমার পরিবারের মানুষকে কীভাবে বোঝাব?	

গল্প ৪ : আত্মমর্যাদা রক্ষায় পদক্ষেপ নিই

স্থান : স্কুলের মাঠ

চরিত্র : সামারাহ, মাহিন, শর্মিষ্ঠা, সুজন

চার সহপাঠী স্কুল মাঠের এক কোণায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

শর্মিষ্ঠা : কী সুজন, আমাদের বন্ধুদের অনেকের সাইকেল আছে, তোমার নাই কেন?

সুজন : আমি বাবাকে সাইকেল কিনে দেওয়ার কথা জানিয়েছি, পরে কিনে দিবে বলছে।

শর্মিষ্ঠা : তোমার সাইকেল কেনা হতে হতে আমরা কলেজে উঠে যাব।

(শর্মিষ্ঠার কথা শুনে মাহিন হেসে দিল)।

মাহিন : তোমার বাবাকে আবার বলো। বারবার বললে হয়তো কিনে দেবেন।

শর্মিষ্ঠা : ও আর বলবে! কিছু বলার সাহস আছে, থাকলে এতদিনে দুইটা সাইকেল হয়ে যেত।

মাহিন : হে হে হে! আহারে বেচারা।

সুজন : আমি বাবাকে বলেছি। বাবা আমাকে বুঝিয়ে বলেছে কেন এখনই সাইকেল কিনে দিতে পারবে না। আমি তার কথা বিশ্বাস করেছি। তাই এ ব্যাপারে আমি চাপ দিতে চাই না।

এরপর সুজন ও শর্মিষ্ঠাও ক্লাসে চলে গেল। সামারাহ আর মাহিন এখনো মাঠে রইল)

সামারাহ : মাহিন, শর্মিষ্ঠা যখন সুজনকে সাইকেল নিয়ে খোঁটা দিচ্ছিল, তখন সুজনের কেমন লাগতে পারে বলোতো?

মাহিন : কেমন লাগবে আবার!

সামারাহ : ওর কষ্ট লেগেছে। দেখলে না কেমন করে চুপচাপ চলে গেল।

মাহিন : আমি তো খারাপ কিছু বলিনি।,শর্মিষ্ঠা খোঁটা দিল। আমি তো শুধু বুদ্ধি দিয়েছি কীভাবে সাইকেল পেতে পারে।

সামারাহ : শর্মিষ্ঠা যখন সুজনকে খেপাচ্ছিল তখন ওকে আমার থামানো দরকার ছিল, চুপ থাকা ঠিক হয়নি। আমি কিছু বললাম না কেন সেটা ভেবে খারাপ লাগছে।

মাহিন : কেন? তুমি কেন থামাবে?

সামারাহ : যখন কেউ অন্যকে খেপায় বা ছোট করে, তখন আশপাশের মানুষের হাসা বা চুপ থাকা ঠিক নয়। এতে একই কাজ করার জন্য মানুষটি উৎসাহ পেয়ে যায়। আর যাকে খেপানো হয় সে আরও বেশি কষ্ট পায়,অসহায়বোধ করে।

মাহিন : আচ্ছা, এরপর থেকে আর হাসব না। কিন্তু আমরা আর কী-ই বা করতে পারি!

সামারাহ : আমরা শর্মিষ্ঠাকে বলতে পারতাম সাইকেল কেনাটা ব্যক্তিগত বিষয়। এভাবে ওকে কিছু কেনার জন্য চাপ দেওয়া আমাদের উচিত না। এতে সুজন অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

গল্প অনুযায়ী কোন চরিত্রের সাথে নিচের কথাগুলো মিলে তা নিয়ে চিন্তা করে হ্যাঁ/না/প্রযোজ্য নয় লিখি। আমার বন্ধুর সাথে ছকটি নিয়ে আলোচনা করি এবং আলোচনা শেষে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে করি।

চরিত্র	নিজের প্রয়োজন ও অনুভূতি চিহ্নিত করতে পেরেছে	অন্যের প্রয়োজন ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল	প্রয়োজনে দৃঢ়ভাবে না বলতে পেরেছে	দৃঢ়ভাবে নিজের প্রয়োজন, অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করতে পেরেছে
শর্মিষ্ঠা				
সুজন				
মাহিন				
সামারাহ				

নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে উত্তর তৈরি করি। বন্ধুর সাথে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করি এবং আলোচনা শেষে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে করি।

প্রশ্ন	উত্তর
সামারাহ শর্মিষ্ঠাকে কী বলতে পারত?	
আমাকে কেউ কোনো বিষয়ে জোরাজুরি করলে আমি কী করব?	
কাউকে উত্ত্যক্ত হতে দেখলে আমি কী করব?	
আমাকে কেউ উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করলে আমি কী করব?	

গল্প ৫ : সম্পর্কের যত্নে কথা বলি

স্থান : বাসা

চরিত্র : আমিন, রাবেয়া (আমিনের মা), রহমান (আমিনের বাবা)

আমিন গল্পের বই পড়ছে, এই সময় তার মা এসে তাকে দোকান থেকে পেঁয়াজ কিনে আনতে বলল।

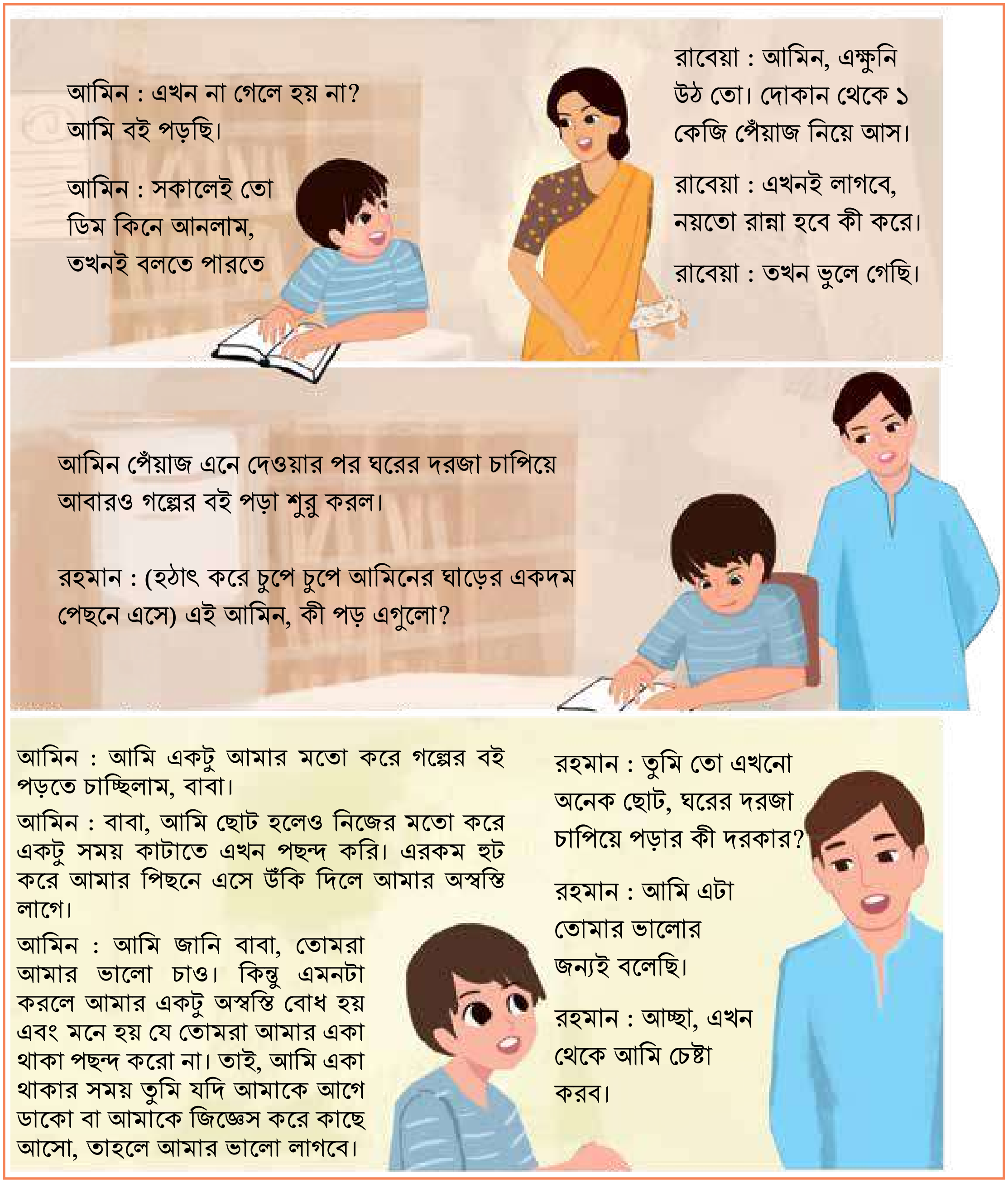

(কিছুক্ষণ পরে.......)

প্রেক্ষাপট : (রহমান চুলায় তরকারি নাড়ছে এবং রাবেয়া পেঁয়াজ কাটছে।)

রাবেয়া : আমার মনে হয় আমাদের এখন থেকে আমিনের ব্যক্তিগত সীমানা নিয়ে ভাবতে হবে। ও এখন বড় হচ্ছে। ওকে নিজের মতো করে সময় কাটাতে দিতে হবে।

রহমান : তা আসলে ঠিক বলেছ। কিন্তু ও একা থাকলে আমার মনে হয় ওর কি শরীর অসুস্থ, মন খারাপ বা বন্ধু বা অন্য কারও সাথে ঝগড়া হয়েছে...

রাবেয়া : তা ঠিক, আমাদেরকেও ওর সাথে ধৈর্য ধরে শান্তভাবে কথা বলতে হবে। তবে আমরাও যেন ওর ব্যক্তিগত সীমানায় অযাচিতভাবে চলে না যাই।

রহমান : এটা ভালো বলেছ। তাহলেই আমিন ওর মনের কথা নির্দ্বিধায় আমাদেরকে বলতে পারবে। তখন ওর সমস্যার কথা আমাদেরকে জানাতেও আর সংকোচ করবে না।

রহমান : ঠিক আছে।
এরপর থেকে তাই করব।

অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা বলি

গল্প অনুযায়ী কোন চরিত্রের সাথে নিচের কথাগুলো মিলে তা নিয়ে চিন্তা করে হ্যাঁ/না/প্রযোজ্য নয় লিখি। আমার বন্ধুর সাথে ছকটি নিয়ে আলোচনা করি এবং আলোচনা শেষে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে করি।

চরিত্র	নিজের প্রয়োজন ও অনুভূতি চিহ্নিত করতে পেরেছে	অন্যের প্রয়োজন ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল	দৃঢ়ভাবে নিজের প্রয়োজন, অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করতে পেরেছে
আমিন			
রাবেয়া			
রহমান			

নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে উত্তর তৈরি করি। বন্ধুর সাথে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করি এবং আলোচনা শেষে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে করি ।

প্রশ্ন	উত্তর
আমিনের কি নিজের মতো সময় কাটানোর সুযোগ থাকা উচিত? কেন? বা কেন নয়?	
আমিনের কোন পদক্ষেপগুলো তার ব্যক্তিগত সীমানা ধরে রাখতে সাহায্য করেছে?	
আমিনের মতো পরিস্থিতিতে পড়লে আমি আমার পরিবারের সদস্যদের কী বলব?	

ওপরের গল্পগুলোতে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের কৌশল

শ্রেণিতে শিক্ষক আমাদের দলে ভাগ করে দিয়ে ওপরের গল্পগুলোতে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের বিভিন্ন কৌশল উল্লেখ করতে বলেছিলেন। এবার সেই কাজটি আমরা নিজে অপর পৃষ্ঠার ছকে করি। কোন কৌশলটি কার্যকর আর কোনটি অকার্যকর মনে হয়েছে, তা উল্লেখ করি।

গল্প	অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের কৌশল	কার্যকর/ অকার্যকর
গল্প ২ : সহমর্মিতা	১. ২. ৩.	
গল্প ৩ : নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করি	১. ২. ৩.	
গল্প ৪ : আত্মমর্যাদা রক্ষায় পদক্ষেপ নিই	১. ২. ৩.	
গল্প ৫ : সম্পর্কের যত্নে কথা বলি	১. ২. ৩.	

অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখব

১। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলি।

আমি যখন অন্যদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলব, তখন আমাকে আত্মবিশ্বাসী মনে হবে। মনে হবে যে আমি ভয় পাচ্ছি না, বা নিজেকে ছোট করেও দেখি না।

২। নিজেকে শান্ত রাখি।

নিজেকে শান্ত রাখতে লম্বা দম নেই। ফুলের ঘ্রাণ নেওয়ার মতো করে দম নেই এবং মোমবাতি ফুঁ দেওয়ার মতো করে দম ছাড়ি। প্রথম প্রথম কাজটি করতে অস্বস্তি লাগলেও, নিয়মিত চর্চা করলে এই কৌশল আমাকে শান্ত রাখতে সাহায্য করবে।

৩। দৃঢ়ভাবে কথা বলি।

যা বলতে চাই খুব স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে বলব, খুব আস্তে বা অনেক উঁচু স্বরেও না। আমি যদি খুব আস্তে কথা বলি সহজে কেউ আমাকে শুনবে না এবং আত্মবিশ্বাসী মনে করবে না। আবার আমি যদি অনেক উঁচু স্বরে কথা বলি তাহলে মনে হতে পারে আমি চিৎকার করছি বা অনেক রেগে কথা বলছি।

৪। গলার স্বর ও অঙ্গভঙ্গির সাথে মিল রেখে অনুভূতি প্রকাশ করি।

কেউ যদি মুখে হাসি হাসি নিয়ে বলে তার মন খারাপ, তাহলে কি আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাব না? এজন্যই আমি যা বোঝাতে চাই তাই যেন বোঝাতে পারি তা নিশ্চিত করার জন্য আমার অনুভূতির সাথে গলার স্বর ও অঙ্গভঙ্গির মিল থাকা জরুরি।

তুমি যখন আমার সাথে চিৎকার করো, আমার কষ্ট লাগে।

তুমি যখন আমার সাথে চিৎকার করো, আমার কষ্ট লাগে।

৫। আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে এমন অঙ্গভঙ্গি বজায় রাখি।

আমি যদি এমনভাবে দাঁড়াই যে, আমাকে দেখলে মনে হয় আমি জড়োসড়ো হয়ে আছি বা ভয় পাচ্ছি, তখন সহজে কেউ আমার কথা গুরুত্ব দিতে চাইবে না। কথা বলার সময় যা খেয়াল রাখব :

- সোজা হয়ে দাঁড়াব বা বসব
- চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলব
- অঙ্গভঙ্গি শান্ত রাখব
- শরীর জড়োসড়ো বা শক্ত করে রাখব না
- হাত মুষ্টিবদ্ধ বা দুই হাত বুকে ভাঁজ করে রাখব না
- মাথা ঝুঁকে আছে এমনভাবে থাকব না

৬। অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি, তার অনুভূতি ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকি।

যখন অপর পাশের মানুষটি কথা বলছে তখন তাকে কথা শেষ করতে দেব। তার কথার মাঝেই কথা বলব না। ওই মানুষটি কী চায় বা অনুভব করে তা বোঝার চেষ্টা করব। সে বিষয়ে নিজের মতো শ্রদ্ধার সাথে প্রকাশ করব। তাকে নিয়ে দোষারোপ বা হাসাহাসি করব না।

৭। ‘আমি/আমার’ শব্দ ব্যবহার করি।

অন্যের সাথে কথা বলার সময় ‘আমি/আমার’ শব্দ ব্যবহার করে নিজের চাওয়া, অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করি। মনের কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না পেলে অন্যের সাথে দূরত্ব বা মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে। যখন আমি বা আমার শব্দ ব্যবহার করে নিজের মনের কথা প্রকাশ করি, তখন আমার কথাটির গুরুত্ব জোরালো হয় এবং অন্যদের পক্ষে আমাদের মতামত গ্রহণ করতে সুবিধা হয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৮। প্রয়োজনে ‘না’ বলি।

কোনো কিছুতে অস্বস্তি লাগলে বা আমার ব্যক্তিগত সীমানা রক্ষা করতে আমি না বলতে পারি। মনে রাখব, আমি যেমন অন্যকে না বলতে পারি, ঠিক তেমনি অন্য কেউ আমাকে না বললে তা সহজ ও ইতিবাচকভাবে শুনব।

চলো আজ ক্লাস বাদ দিয়ে সাইকেল চালাই।

না মানে! আমার এই ক্লাসটা দরকার ছিল, গত ক্লাসে আমি অসুস্থ ছিলাম। ক্লাস না করলে স্যার যদি বকা দেয় আর বাসায়...

চলো আজ ক্লাস বাদ দিয়ে সাইকেল চালাই।

আমি আজকে ক্লাস মিস দিব না। স্যার আমাকে ফাঁকিবাজ ভাবুক তা আমি চাই না। আর আমি গত ক্লাস করতে পারিনি অসুস্থ ছিলাম বলে। আজকে ক্লাস করতেই হবে।

মনে রাখব আমি নিজের প্রয়োজন, অনুভূতি ও মতামত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করব অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে, অন্যের প্রয়োজন, অনুভূতি ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে। তবে অনেকে আমার নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা নিয়ে কষ্ট বা রাগ অনুভব করতে পারে। আমি যদি অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না করি এবং অন্যের প্রয়োজন, অনুভূতি ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকি, তাহলে তার কষ্ট বা রাগ অনুভূতির দায়/দোষ আমার না। এ নিয়ে আমার মন খারাপ হতে পারে; কিন্তু ওই মানুষটির অনুভূতির দায়িত্ব তার নিজের।

অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চা : আমার পরিকল্পনা

আমার দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন পরিস্থিতিতে আরও দৃঢ়ভাবে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করার সুযোগ আছে? নিচের ছকে এমন ৩টি পরিস্থিতির একটি তালিকা করি। যাদের সাথে মনের কথা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে হবে সে মানুষদের শনাক্ত করি। তারা হতে পারেন আমার বাবা-মা, ভাই-বোন, যেকোনো আত্মীয়, বন্ধু, শিক্ষক, ওপরের বা নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থী; আমার এলাকার পরিচিত কোনো ব্যক্তি বা অন্য যে কেউ।

তালিকা : দৈনন্দিন জীবনে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চা

কোন ব্যক্তির সাথে	কোন পরিস্থিতিতে

এবার তালিকা অনুযায়ী ৩টি পরিস্থিতিতে কীভাবে তাদের সাথে কথা বলব তার পরিকল্পনা করি এবং নিচের ছক ব্যবহার করে লিখি। পরিকল্পনার সুবিধার্থে ৫ নং গল্প অবলম্বনে প্রথম ছকটি করে দেওয়া হলো।

নমুনা পরিকল্পনা ছক : অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চা (গল্প ৫ অবলম্বনে নমুনা উত্তর)

কার সাথে যোগাযোগ : বাবা, মা	
ঘটনা : (যা ঘটেছে)	বাবা যখন হুট করে আমার ঘরের দরজা খুলে ঢুকে পড়ে
অনুভূতি : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	আমি অনেক বিব্রত বোধ করি
কারণ : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	কারণ আমার মনে হয় যে আমার যে মাঝে মাঝে একা থাকা প্রয়োজন, এটা বাবা পছন্দ করছে না বা বুঝতে পারছে না
চাওয়া : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	আমার জন্য ভালো হয় যদি বাবা ঘরে ঢোকার আগে দরজায় টোকা দেয়।

পরিকল্পনা ছক ১ : অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চা	
কার সাথে যোগাযোগ :	
ঘটনা : (যা ঘটেছে)	
অনুভূতি : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	
কারণ : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	
চাওয়া : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	

পরিকল্পনা ছক ২ : অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চা	
কার সাথে যোগাযোগ :	
ঘটনা : (যা ঘটেছে)	
অনুভূতি : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	
কারণ : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	
চাওয়া : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	

পরিকল্পনা ছক ৩ : অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চা	
কার সাথে যোগাযোগ :	
ঘটনা : (যা ঘটেছে)	
অনুভূতি : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	
কারণ : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	
চাওয়া : (আমি/আমার শব্দ ব্যবহার করে বলি)	

ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করি

অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা কীভাবে প্রকাশ করতে হয় তার ওপর আমরা শ্রেণিতে ভূমিকাভিনয় করব। আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে যেকোনো একটি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। ওই পরিস্থিতিতে কীভাবে দৃঢ়ভাবে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করতে পারব সে পরিকল্পনা করি। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেরা মিলে ভূমিকাভিনয় করি। ভূমিকাভিনয়ের সময় অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের জন্য যে বিষয়গুলো মনে রাখতে বলা হয়েছে সেগুলোও বিবেচনায় রাখব।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার নিজের জীবনে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চা করি

কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চা করব তা নিয়ে কয়েকটি পরিকল্পনা করেছি। এখন ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চার একটি রেকর্ড রাখি। সামনের এক মাস বিশ্বস্ত সম্পর্ক উন্নয়নের চর্চাসংক্রান্ত ঘটনাগুলোর বিবরণ ডায়েরি বা জার্নালে লিখে রাখি। অপর পৃষ্ঠার ছকের মতো করে অথবা আমার যেভাবে পছন্দ সেভাবে ডায়েরি বা জার্নালে লিপিবদ্ধ করে এক মাস পর শিক্ষকের কাছে জমা দিই।

	দৈনন্দিন জীবনে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চার রেকর্ড			
তারিখ	কোন ব্যক্তির সাথে	কোন পরিস্থিতিতে	চর্চা করতে পেরেছি? (হ্যাঁ/না)	চর্চা করে আমার কেমন লেগেছে?

সেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করে সফলভাবে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা বলার উপায়গুলো বের করে আনার জন্য অভিনন্দন।

আমার অগ্রগতি, আমার অর্জন

অপর পৃষ্ঠার ছকগুলো শিক্ষক পূরণ করবেন। এর মাধ্যমে আমার অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দেবেন। উৎসাহ দেবেন। কীভাবে আরও ভালো করতে পারি সেই উপায় জানাবেন। শিখন কার্যক্রমে ওপর ভিত্তি করে আমার কাজগুলোর মান অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।

ছক ১ : আমার অংশগ্রহণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ে করা কাজ

	সেশনে আমার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ	অংশগ্রহণের সময় অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাশীল আচরণ	আমার স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ে করা কাজগুলোর মান
শিক্ষকের মন্তব্য ও পরামর্শ			

ছক ২ : আমার দলের ভূমিকাভিনয়

ভূমিকাভিনয় দল	ভূমিকাভিনয় পরিকল্পনার কাজগুলোতে আন্তরিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ	বিমূর্ত ধারণায়ন ধাপে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা ব্যক্তিগত পরিকল্পনার সাথে ভূমিকাভিনয় পরিকল্পনার সামঞ্জস্য	ভূমিকাভিনয়ে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের কৌশল, ৪টি ধাপসহ ছক ও মনে রাখার ৮টি বিষয়সংক্রান্ত ধারণাগুলোর সঠিক প্রতিফলন
শিক্ষকের মন্তব্য			

ছক ৩ : আমার অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চা

	আমার করা পরিকল্পনাগুলোর মান	পরিকল্পনা অনুযায়ী করা চর্চা বা কাজগুলো জার্নালে লেখা	চর্চা বা কাজগুলোতে অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের সঠিক ধারণাগুলোর প্রতিফলন
বর্ণনামূলক ফিডব্যাক			

সম্পর্কের যত্নে খুঁজে পাই রত্ন

আমরা একধরনের রত্ন খোঁজার কাজ করব। রত্ন খোঁজার বিষয়টি তো আমরা সবাই জানি, তাই না? রাশি রাশি হীরা, মণি, মাণিক্য, সোনা, রুপা-এসব রত্ন কোথাও লুকিয়ে রাখা থাকে। তারপর সূত্র ধরে ধরে সেসব খুঁজে বের করা হয়। শিশু-কিশোরদের অ্যাডভেঞ্চার গল্পে বা জলদস্যুদের কাহিনিতে এমন কত রত্ন খোঁজার কথা আমরা পড়েছি! আমরা রত্ন খুঁজব, কিন্তু সেই রত্ন হীরা, মণি, মাণিক্য নয়; অন্য কিছু, আরও বড় কিছু। সেই রত্নগুলোই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের সাথি হয়, সুখে-দুঃখে পাশে থাকে। এই রত্নগুলো হলো আমাদের একে অন্যের সাথে সুন্দর সম্পর্ক।

মানুষ সামাজিক প্রাণী। অন্য মানুষের সাথে আমরা মিলেমিশে থাকি। একে অন্যের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে আমাদের সামাজিক জগৎ। এই সম্পর্কগুলো বইয়ের ভাষায় আমরা বলি আন্তঃসম্পর্ক। এখানে আমরা আমাদের এই সম্পর্কগুলো চিহ্নিত করব। আন্তঃসম্পর্কগুলোর সুবিধা ও গুরুত্বগুলো ভেবে বের করব। কখনো কখনো আন্তঃসম্পর্কে চ্যালেঞ্জ বা ঝুঁকি তৈরি হয়। সেই ঝুঁকিগুলো আমরা চিহ্নিত করব। বিশ্বস্ত সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলো কী এবং কীভাবে বিশ্বস্ত সম্পর্ক তৈরি ও রক্ষা করতে হয় সেই উপায়গুলো খুঁজে বের করব। আমাদের চারপাশে যে সেবাকাঠামোগুলো আছে তা খুঁজে বের করব। আমরা পরিকল্পনা করব কীভাবে ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশ্বস্ত সম্পর্ক কাজে লাগাতে হয়; কীভাবে সেবাকাঠামো থেকে সহায়তা নিতে হয়। পরিকল্পনা করে সেগুলো শ্রেণিতে অভিনয় করে দেখাব। এর পাশাপাশি নিজেদের জীবনে বিশ্বস্ত সম্পর্ক গড়ে তোলার চর্চা করব। আর এসব কিছুই আমরা করব আমাদের অভিজ্ঞতার ব্যবহার করে। এভাবেই আমরা আমাদের আন্তঃসম্পর্ক বা রত্নগুলো চিনে সেগুলো আরও সুন্দর করার পথে এগিয়ে যাব।

আর দেরি নয়। চলো শুরু করা যাক।

আমার আন্তঃসম্পর্ক

শ্রেণিকক্ষে আমরা আমাদের আন্তঃসম্পর্কগুলোর ছবি এঁকে বা ছকে দেখাব। এই সম্পর্কগুলো হতে পারে আমাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক বা অন্য যেকোনো সম্পর্ক।

- শ্রেণিকক্ষে আন্তঃসম্পর্কের ছবিটি আঁকতে প্রয়োজনে বাবা-মা অথবা অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে নিতে পারি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আঁকার কাগজ সরবরাহ করবেন অথবা আমরা বাসা থেকে অব্যবহৃত সাদা কাগজ বা ক্যালেন্ডারের উল্টো অংশের সাদা পাতা নিয়ে যেতে পারি।

- ছবি আঁকতে গিয়ে কিছু বোঝার প্রয়োজন হলে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করব। অনেক মানুষের সাথে সম্পর্ক থাকলে যেগুলো বেশি নিবিড় বা নিয়মিত, শুধু সেগুলো এঁকে দেখাতে পারি। ছবি বা ছক ছাড়া অন্যভাবে করতে চাইলেও পারি। যেমন : ছড়া, কবিতা বা গান লিখেও সম্পর্কগুলোকে দেখাতে পারি।
- শ্রেণিতে আন্তঃসম্পর্কের ছবি আঁকা শেষ করেছি। এবার আমার নিজের আন্তঃসম্পর্কগুলো আঁকার পালা। অপর পৃষ্ঠার ছবিটিতে আমার আন্তঃসম্পর্কগুলো দেখাব। প্রতিটি তীর চিহ্নের পাশে আমার আন্তঃসম্পর্কগুলো লিখি। যেমন : 'পরিবার' লেখা বৃত্তের সাথে তীরচিহ্নগুলোতে পরিবারের আন্তঃসম্পর্কগুলো লিখব।

আন্তঃসম্পর্কগুলোর সুবিধা ও গুরুত্ব (কেন এগুলো আমাদের রত্নের মতো)

- আমাদের আন্তঃসম্পর্কগুলো তো আমরা জানলাম। আমাদের জীবনে এসব সম্পর্কের সুবিধা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। আমার কাছে আন্তঃসম্পর্কের প্রধান গুরুত্বগুলো কী তা অপর পৃষ্ঠার বৃত্ততে লিখি। সব বৃত্তে লেখার পর যদি আরও কিছু লিখতে চাই তাহলে ডায়াগ্রামটির নিচের খালি অংশেও লিখতে পারি :
- পূরণ করা ডায়াগ্রামটির দিকে তাকিয়ে দেখি। কত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে আমাদের জীবনে! প্রতি মুহূর্তে এই সম্পর্কগুলো আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, ভালো রাখে। তাই এসব সম্পর্কই আমাদের জীবনের আসল রত্ন বা গুপ্তধন।

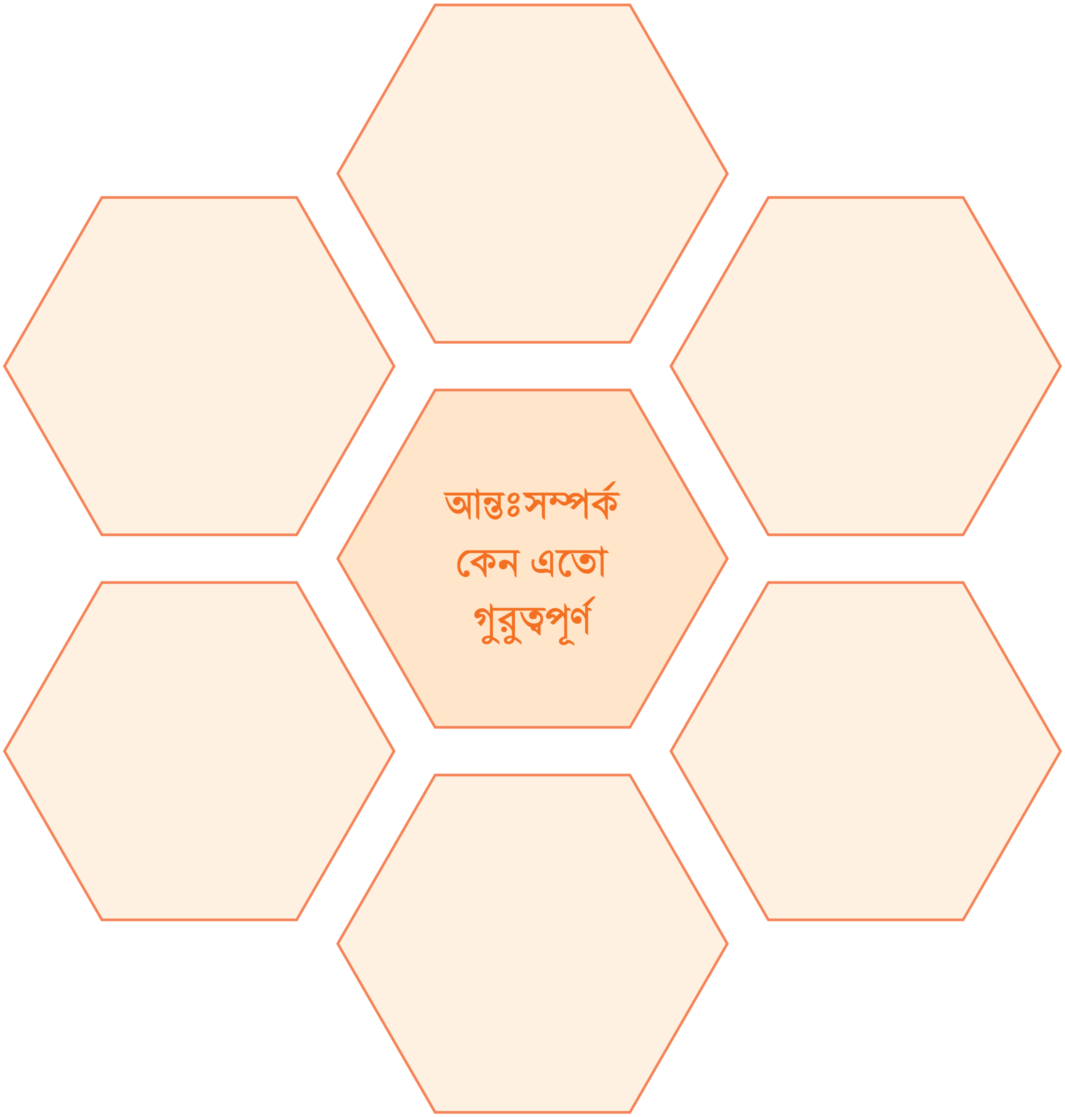

আমার সবচেয়ে নিরাপদ ও বিশ্বস্ত সম্পর্ক

- আন্তঃসম্পর্কের গুরুত্বগুলো আমরা ভেবে বের করেছি। এবার আমরা জানব আমাদের সবচেয়ে নিরাপদ ও বিশ্বস্ত সম্পর্ক বিষয়ে। শুরুতেই আমাদের বিশ্বস্ত সম্পর্কের কয়েকটি ছবি এঁকে নিই।
- আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত, সুখ-দুঃখের সাথি, মন খুলে কথা বলতে পারি, বিপদে ভরসা করতে পারি— এমন কয়েকজন মানুষের ছবি এঁকে ফেলি। তিনি হতে পারেন আমার বাবা-মা, দাদা/দাদি, নানা/নানি, ভাই/বোন, বন্ধু/বান্ধবী, শিক্ষক-যে কেউ। অপর পৃষ্ঠায় এমন ৪টি ছবি আঁকতে পারি, কম আঁকলেও চলবে। আমাদের কাছে তাদের তোলা ছবি থাকলে সেগুলো বক্সে আঠা দিয়ে সেঁটে দিতে পারি, তবে সেক্ষেত্রে আগে তাদের অনুমতি নিয়ে নেব।

আমার কয়েকজন বিশ্বস্ত মানুষের ছবি

- ছবি তো আঁকা হলো। এবার আমরা একটু ভাবি, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্য এঁদের সাথে আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সম্পর্ক। তাদের কোন আচরণের জন্য তাদের বিশ্বস্ত মনে করছি। কীভাবে আমরা এই সম্পর্ক আরও বিশ্বস্ত ও সুন্দর করে তুলতে পারি। শ্রেণিতেও আমাদের সাথে নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সেসবের আলোকে নিজে ভেবে পরের পৃষ্ঠার আমার বিশ্বস্ত সম্পর্ক ছকটি পূরণ করি।

আমার বিশ্বস্ত সম্পর্ক

কেন এই সম্পর্কগুলোকে আমি বিশ্বস্ত মনে করছি	এই সম্পর্কগুলোকে আরও সুন্দর করার জন্য আমি কী করতে পারি

- এই বিশ্বস্ত সম্পর্কগুলো হলো আমাদের সব রত্নের সেরা রত্ন, সেরা গুপ্তধন। তাই এগুলোর যত্ন নিতে হবে। এসব সম্পর্ক আরও সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

আন্তঃসম্পর্কের ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ

- এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জানলাম সম্পর্কের সুবিধা ও গুরুত্ব। তবে কখনো কখনো সম্পর্ক থেকে ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জও তৈরি হতে পারে। কখনো সেই ঝুঁকি হতে পারে অপরিচিত মানুষ দ্বারা; আবার কখনো আমাদের চেনা-জানা মানুষ থেকেও হতে পারে। এমনকি পরিবার, আত্মীয় বা প্রতিবেশী থেকেও হতে পারে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আমাদের দলে ভাগ করে এ রকম কয়েকটি ঝুঁকির কেস/ঘটনা পড়তে দিয়েছিলেন। আমরা শ্রেণিতে উপস্থাপনও করেছি। নিচে ঘটনাগুলোর প্রক্ষিতে নিজের মতো করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি।

ঘটনা ১

অনন্যা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। প্রতিদিন সে স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথে তার এলাকার একটি ছেলে তাকে উত্ত্যক্ত করে, অশোভন মন্তব্য করে। তার খুব ভয় কাজ করে, হাত-পা কাঁপে, সে একা চলাফেরা করতে পারে না, মনে হয় কেউ তাকে অনুসরণ করছে। সে খুব অনিরাপদবোধ করে এবং আতঙ্ক লাগে যে ছেলেটা যদি তার কোনো ক্ষতি করে। সে বুঝতে পারছে না যে এই পরিস্থিতিতে সে কী করবে বা কীভাবে তার বাবা-মাকে বিষয়গুলো জানাবে। সে এতটাই মানসিক চাপ বোধ করছে যে সে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না।

এখানে সমস্যা বা ঝুঁকিটি কী? ______________________

____

কেন এই সমস্যা বা ঝুঁকিটি হচ্ছে? ______________________

____

সমস্যা বা ঝুঁকিটির ফলে কী কী শারীরিক বা মানসিক প্রভাব পড়ছে? ______________________

____

____

ঘটনা ২

শোভন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। সহপাঠীদের তুলনায় তার শরীর কিছুটা স্থূলকার। তার ২/১ জন সহপাঠী মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, বিদ্রুপ করে ও ব্যঙ্গাত্মক নামে ডাকে। এমনকি তারা তাকে খেলায় নেয় না, তাদের সাথে মিশতে গেলে তারা তাকে গুরুত্ব দেয় না, এড়িয়ে চলে। শোভনের এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব মন খারাপ থাকে। তার নিজেকে খুব ছোট মনে হয়, খুব একা আর অসহায় লাগে। ধীরে ধীরে তার আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে, সে সবকিছুতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে ও হতাশ হয়ে পড়ছে। সে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না। আজকাল তার কারও সাথে মিশতেও খুব ভয় হয়।

এখানে সমস্যা বা ঝুঁকিটি কী? ______________________

____

কেন এই সমস্যা বা ঝুঁকিটি হচ্ছে? ______________________

____

সমস্যা বা ঝুঁকিটির ফলে কী কী শারীরিক বা মানসিক প্রভাব পড়ছে? ______________________

____

____

ঘটনা ৩

রাফির বয়স ১২। ওরা দুই ভাই বোন—রাফি আর মনিকা। মনিকা বড়। মনিকা কিছুদিন আগে বিদেশে চলে যায়। ওখানে পড়াশোনা করছে। রাফি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। বোনের সাথে রয়েছে বয়সের ব্যবধান। বোন বিদেশে চলে যাওয়াতে কেমন চুপচাপ হয়ে যায়। বোন বিদেশ থেকে মোবাইল পাঠায়। লকডাউনে স্কুল বন্ধ হবার পর আরও একা হয়ে যায় রাফি। মা ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বাবা ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকে বেশি। এই সব ভালো লাগে না রাফির। ইদানীং অনলাইনে কিছু বন্ধুর কাছ থেকে গেম খেলা শিখেছে। সারাদিন সারারাত মোবাইলে গেম খেলে। খাওয়া, ঘুম, সামাজিকতা কিছুই নেই। মোবাইলে যদি চার্জ না থাকে তাতে সে উদ্বিগ্ন হয়। রুম থেকে বের হয় না। একটা রুমেই বন্দি করে ফেলেছে সে নিজেকে। অসম্ভব মেজাজ হয়েছে তার। সব কিছু কেড়ে নিয়েছে এই মোবাইল যন্ত্রটি। রাফির বাবা-মায়ের মতে সব কিছুর মূলে এই মোবাইল এবং তার প্রতি নির্ভরশীলতা।

এখানে সমস্যা বা ঝুঁকিটি কী?

কেন এই সমস্যা বা ঝুঁকিটি হচ্ছে?

সমস্যা বা ঝুঁকিটির ফলে কী কী শারীরিক বা মানসিক প্রভাব পড়ছে?

ঘটনা ৪

সেলিনার বয়স ১১। সামনে ওর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা। বাবা-মায়ের স্বপ্ন মেয়ে অনেক বড় হবে। তাই কড়া শাসনে রাখে। পড়ার জন্য অনেক চাপ দেয় ওকে। সবার চেয়ে ভালো করতে হবে ওর। স্কুল আর কোচিং—এই নিয়েই ওর জীবন। খেলাধুলার সুযোগ নেই। স্কুলের পরীক্ষায় সবার চেয়ে ভালো করতে না পারলে বাবা-মা শাসন করেন। অথচ ওর বন্ধুদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে ভালো লাগে না। সেলিনার এখন পড়ার কথা ভাবলেই বিরক্ত লাগে। পরীক্ষার কথা ভাবলেই টেনশন হয়। ঘাম হয়। হতাশ লাগে, ঘুম আসে না। ওর ইচ্ছে করে সব ছেড়ে দিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে।

এখানে সমস্যা বা ঝুঁকিটি কী?

কেন এই সমস্যা বা ঝুঁকিটি হচ্ছে?

সমস্যা বা ঝুঁকিটির ফলে কী কী শারীরিক বা মানসিক প্রভাব পড়ছে?

- এবার এই ঝুঁকিগুলোর আলোকে ভাবি, আমার নিজের জীবনে কি এগুলোর কোনোটার মুখোমুখি হয়েছি? এসব ঝুঁকির বাইরেও আর কী ঝুঁকি আমার বা আমার কমিউনিটিতে থাকতে পারে বলে মনে করছি? সেই ঝুঁকিগুলো আমি কীভাবে বুঝব? এই ঝুঁকির ফলে আমার ওপর বা কমিউনিটিতে কী প্রভাব পড়তে পারে? শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবার আমার নিজের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ৩টি ঝুঁকির কথা ভাবি। বাবা-মা বা কমিউনিটির বিশ্বস্ত কার সাথেও এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এরপর নিচের ছকটি পূরণ করি।

আমি কী কী ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারি	ঝুঁকিগুলো আমি কীভাবে বুঝব	ঝুঁকিগুলো আসার আগেই সতর্ক হওয়া বা এলে মোকাবিলা করা কেন জরুরি
১.		
২.		
৩.		

ঝুঁকি মোকাবিলায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান

- সম্পর্কের ঝুঁকি নিরসনে বিশ্বস্ত আন্তঃসম্পর্ক ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি প্রয়োজন হলে রয়েছে নানা রকম সেবা প্রতিষ্ঠান। সেগুলো সরকারি, বেসরকারি, এনজিওভিত্তিক হতে পারে। যেমন : থানা, সমাজসেবা অফিস, হাসপাতাল, তথ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, নানা ধরনের সেবামূলক ক্লাব ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে ৯৯৯ জরুরি সেবা এবং শিশু সুরক্ষাবিষয়ক নম্বর : ১০৯৮ । এই নম্বরে ফোন করলে যেকোনো ঝুঁকি মোকাবিলায় সাথে সাথে সাহায্য পাওয়া যায়। এগুলো মিলেই আমাদের সেবাকাঠামো। আমরা শ্রেণিকক্ষে এই সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। পাশাপাশি ইন্টারনেটে খুঁজে বা কমিউনিটির দু-একজন সেবাকর্মীর সাথে কথা বলি। সেই আলোচনা আলোকে আমাদের এলাকার সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি মানচিত্র আঁকি। আমরা মানচিত্রের নমুনাও দেখেছি। নিচে তেমন একটি নমুনা দেওয়া হলো। সেগুলো অনুসরণ করে বা নিজের মতো করে আঁকি।

- খুব সুন্দরভাবে আমরা মানচিত্র এঁকে আমার এলাকার সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করেছি। এগুলোতে আমরা হয়তো সরাসরি গিয়ে সেবা নিতে পারি। এরকম ৫টি সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং ই-মেইল অ্যাড্রেসের তালিকা নিচের ছকে পূরণ করি। প্রয়োজনে শিক্ষকের সাহায্য নিই, ইন্টারনেটে খোঁজ করি বা কমিউনিটির দু-একজন সেবাকর্মীর সাথে কথা বলি।

আমার এলাকার সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম	ঠিকানা	ফোন	ই-মেইল (যদি থাকে)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

- আবার কিছু সেবা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো বেশ দূরে। হয়তো জেলা সদরে, অন্য জেলায় বা রাজধানীতে। তাই আমাদের পক্ষে সরাসরি যাওয়া কঠিন। কিন্তু হয়তো ফোন বা ই-মেইলে যোগাযোগ করে সেবা পাওয়া সম্ভব।

বিশ্বস্ত সম্পর্ক ও সেবা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে আমার ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ নিরসনের পরিকল্পনা

- আমরা ইতিমধ্যে আমাদের সম্পর্কের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করেছি। ঝুঁকির লক্ষণ ও প্রভাবগুলোও ভেবে বের করে লিখেছি। বিশ্বস্ত সম্পর্ক ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোও আমাদের জানা হয়ে গেছে। এবার আমরা ভেবে বের করব ঝুঁকি নিরসনের উপায়। এ কাজে কীভাবে বিশ্বস্ত সম্পর্ক কাজে লাগাব, কীভাবে সেবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেব সেগুলো আমরা ভেবে বের করব। মনে রাখব, সব সময়ই যে সেবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হবে তা নয়। অনেক ঝুঁকি বিশ্বস্ত সম্পর্কের সাহায্য নিয়েই দূর করা যায়। অর্থাৎ আমাদের যেই যেই আসল রত্নগুলো আছে, সেই রত্ন ব্যবহার করে কীভাবে নকল রত্ন থেকে দূরে থাকব সেটাই এবার আমরা জানব। শ্রেণিতে ইতোমধ্যে শিক্ষক আমাদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনার আলোকে নিচের পরিকল্পনা ছকটি পূরণ করি।

ঝুঁকিসমূহ	কোন বিশ্বস্ত সম্পর্কের সাহায্য নেব	কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেব (যদি প্রয়োজন হয়)

ভূমিকাভিনয়ে খুঁজে পাই সমাধান

- আগের দুটি সেশনে আমরা ঝুঁকি নিরসনে ব্যক্তিগত পরিকল্পনা করেছি। সেই পরিকল্পনা কাজে লাগিয়ে দলে ভাগ হয়ে শ্রেণিতে ভূমিকাভিনয় করেছি। যেই ৪টি ঝুঁকি নিয়ে ঘটনা বিশ্লেষণ করেছিলাম, সেই ৪টি ঘটনার ওপর ভূমিকাভিনয় করেছি। ভূমিকাভিনয়ে আমরা বিশ্বস্ত সম্পর্ক ব্যবহার ও সেবা প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের (যদি প্রয়োজন হয়) অভিনয় করে দেখিয়েছি। এবার ভূমিকাভিনয়গুলোর আলোকে ঘটনা ৪টির জন্য নিচের অংশগুলো পূরণ করি।

ঘটনা ১-এর আলোকে করা ভূমিকাভিনয়ের ওপর প্রতিফলন :

- আমি/আমার সহপাঠীরা ঝুঁকিটি নিরসনে ভূমিকাভিনয়ে কীভাবে বিশ্বস্ত সম্পর্কের সাহায্য নিয়েছি/নিয়েছে

- আমি/আমার সহপাঠীরা ঝুঁকিটি নিরসনে ভূমিকাভিনয়ে কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়েছি/নিয়েছে (যদি প্রয়োজন হয়)

ঘটনা ২-এর আলোকে করা ভূমিকাভিনয়ের ওপর প্রতিফলন :

- আমি/আমার সহপাঠীরা ঝুঁকিটি নিরসনে ভূমিকাভিনয়ে কীভাবে বিশ্বস্ত সম্পর্কের সাহায্য নিয়েছি/নিয়েছে

- আমি/আমার সহপাঠীরা ঝুঁকিটি নিরসনে ভূমিকাভিনয়ে কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর সাহায্য নিয়েছি/নিয়েছে (যদি প্রয়োজন হয়)

ঘটনা ৩-এর আলোকে করা নাটিকা/ভূমিকাভিনয়ের ওপর প্রতিফলন :

- আমি/আমার সহপাঠীরা ঝুঁকিটি নিরসনে ভূমিকাভিনয়ে কীভাবে বিশ্বস্ত সম্পর্কের সাহায্য নিয়েছি/নিয়েছে

- আমি/আমার সহপাঠীরা ঝুঁকিটি নিরসনে ভূমিকাভিনয়ে কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়েছি/নিয়েছে (যদি প্রয়োজন হয়)

ঘটনা ৪-এর আলোকে করা ভূমিকাভিনয়ের ওপর প্রতিফলন :

- আমি/আমার সহপাঠীরা ঝুঁকিটি নিরসনে ভূমিকাভিনয়ে কীভাবে বিশ্বস্ত সম্প/র্কের সাহায্য নিয়েছি/নিয়েছে

- আমি/আমার সহপাঠীরা ঝুঁকিটি নিরসনে ভূমিকাভিনয়ে কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়েছি/নিয়েছে (যদি প্রয়োজন হয়)

- এই ভূমিকাভিনয়ের অভিজ্ঞতাটি আমাদের ব্যক্তিগত পরিকল্পনার শিখনটিকে আরও দৃঢ় করেছে। আমরা নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছি বিশ্বস্ত সম্পর্কগুলোই আমাদের আসল রত্ন। এগুলোর সাহায্য নিতে পারলে ভালো থাকা যায়, ঝুঁকি কমানো যায়।

বিশ্বস্ত সম্পর্ক আরও সুন্দর করায় আমার ব্যক্তিগত চর্চা

- গত ১২টি সেশনে আমরা গুপ্তধন খোঁজা, আসল রত্ন জানা, সেই রত্নগুলোকে ব্যবহারের উপায় বের করেছি। সবচেয়ে নিরাপদ ও বিশ্বস্ত সম্পর্কগুলোই হলো আমার আসল রত্ন। সামনের দিনগুলোতে এই বিশ্বস্ত সম্পর্ককে আরও ভালো করার চর্চা করব। আমরা ইতোমধ্যে আমাদের বিশ্বস্ত সম্পর্কের ছবি এঁকেছি। এবার সেখান থেকে ১-২টি বিশ্বস্ত সম্পর্ককে বেছে নিই। সম্পর্কগুলো আরও ভালো করার ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি তা চিহ্নিত করেছি। প্রয়োজন হলে শিক্ষক ফিডব্যাক দিয়ে পরিকল্পনাটিকে আরও ভালো করায় সাহায্য করবেন। পরের এক মাস বিশ্বস্ত সম্পর্ক উন্নয়নের চর্চাসংক্রান্ত ঘটনাগুলোর বিবরণ ডায়েরি বা জার্নালে লিখে রাখব। এই সময়ে কোনো ঝুঁকির মুখোমুখি হলে বিশ্বস্ত সম্পর্কের সাথে কীভাবে শেয়ার করেছি, মতামত নিয়েছি সেগুলোও ডায়েরি বা জার্নালে লিপিবদ্ধ করব। এ ব্যাপারে শিক্ষক দরকার হলে আরও নির্দেশনা দেবেন। নিচের ছকের মতো করে বা আমার যেভাবে পছন্দ সেভাবে ডায়েরি বা জার্নালে লিপিবদ্ধ করে এক মাস পর শিক্ষকের কাছে জমা দেব।

তারিখ	বিশ্বস্ত সম্পর্ক উন্নয়নের চর্চাসংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ (কোনো ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশ্বস্ত সম্পর্কের সাহায্য নিয়ে থাকলে সেটির বিবরণসহ)	এটি আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনো কাজ/লক্ষ্যটি অর্জনে ভূমিকা রাখছে

সেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করে সফলভাবে ট্রেজার হান্ট বা রত্ন খুঁজে বের করে আনার জন্য অভিনন্দন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমার অগ্রগতি, আমার অর্জন

নিচের ছকগুলো শিক্ষক পূরণ করবেন। এর মাধ্যমে আমার অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দেবেন, উৎসাহ দেবেন। কীভাবে আরও ভালো করতে পারি সেই উপায় জানাবেন। শিখন কার্যক্রমে ওপর ভিত্তি করে আমার কাজগুলোর মান অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।

ছক ১ : আমার অংশগ্রহণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ে কাজ

শিক্ষার্থীর নাম :			
	শ্রেণিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ	অংশগ্রহণের সময় অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ	স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ে সম্পাদিত সেশন সংশ্লিষ্ট কাজের মান
শিক্ষকের মন্তব্য			

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ছক ২ : আমার দলের ভূমিকাভিনয়

ভূমিকাভিনয় দল			
	নাটিকা/ভূমিকাভিনয় পরিকল্পনার কাজগুলোতে আন্তরিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ	শিক্ষার্থীদের তৈরি করা ব্যক্তিগত পরিকল্পনার সাথে নাটিকা/ভূমিকাভিনয় পরিকল্পনার সামঞ্জস্য	নাটিকা/ভূমিকাভিনয়ে ঝুঁকি, বিশ্বস্ত সম্পর্ক ও সেবাকাঠামো সংক্রান্ত ধারণাগুলোর সঠিক প্রতিফলন
শিক্ষকের মন্তব্য			

ছক ৩ : আমার বিশ্বস্ত সম্পর্ক উন্নয়নের চর্চা

শিক্ষার্থীর নাম:			
	বিশ্বস্ত সম্পর্ক উন্নয়নের পরিকল্পনার যথাযথতা	পরিকল্পনার আলোকে বিশ্বস্ত সম্পর্ক উন্নয়নের চর্চা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো জার্নালে লিপিবদ্ধকরণ (কোনো ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশ্বস্ত সম্পর্কের সাহায্য নিয়ে থাকলে সেটির বিবরণসহ)	বিশ্বস্ত সম্পর্ক উন্নয়নের চর্চায় এ সংক্রান্ত ধারণাগুলোর সঠিক প্রতিফলন
বর্ণনামূলক ফিডব্যাক			

মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম

মানুষের চিন্তা, আবেগ ও আচরণ এই তিন মিলেই হলো মানসিক স্বাস্থ্য। মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সহপাঠক্রমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সংগীত, চিত্রকলা, খেলাধুলা, বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর ইতিবাচক মনোবৃত্তি তৈরি করে সুস্থ রাখে; যেকোনো পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে এবং সমাজে নিজেকে উৎপাদনশীল রাখে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণি

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য